Vol. 11 | No. 1 | 1967

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

লালন শাহের জীবন-কথা

Volume	11
Issue	1
Year	1967
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	এস. এম. লুৎফর রহমান
Published online	June 15, 1967
DOI	10.62328/sp.v11i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v11i1.2
Pages	21-86
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

লালন শাহের জীবন-কথা

এস. এম. লুৎফর রহ্‌মান

॥ ১ ॥

লালন শাহ্ বাঙ্‌লার লোক-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম দিকপাল। প্রায় পৌণে এক শতাব্দী পূর্বে এই কালোত্তর প্রতিভার তিরোভাব ঘটেছে। তথাপি তাঁর জীবনীর কোন নির্ভরযোগ্য আলোচনা আজো লিপিবদ্ধ হয়নি। কারণ তাঁর দীর্ঘ-জীবনের কাহিনী-রচনায় প্রয়োজনীয় উপকরণ খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। প্রাচীন বাঙ্‌লা সাহিত্যের শ্রেষ্টতম গীতিকবি চণ্ডীদাসের মতই লালন শাহ্ সারাজীবন আত্ম-লোপের সাধনা করে গিয়েছেন। কোথাও তিনি নিজের পরিচয় রেখে যাননি। মধ্যযুগের ঐতিহ্যবাহী কবি হয়েও লালন শাহ্ তাই মধ্যযুগীয় কবিদের থেকে এ-ব্যাপারে আশ্চর্যরকম পৃথক। বাঙ্‌লা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর রচিত কয়েক হাজার গান সংগৃহীত হয়েছে। সে সবের মধ্যে এমন একটি রচনাও পাওয়া যায়নি—যার মধ্যে লালন-জীবনীর সুস্পষ্ট তথ্য-নির্দেশ বিধৃত। নিজের সম্পর্কে তাঁর এ-নির্লিপ্তি প্রায় সীমাহীন। আত্ম-পরিচয় দানে লালনের সামান্যতম আগ্রহও ছিলনা। বরং গভীর বিতৃষ্ণা থাকায় সমকালে জীবিত লালনের প্রতিবেশীরাও তাঁর সম্পর্কে খুব কমই জ্ঞাত ছিলেন। জাতি-গোত্র-বংশ ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর বিতৃষ্ণার সাক্ষ্য লালন-গীতির মধ্যেই পাওয়া যায়। যেমন,

…লালন বলে হাতে পেলে
'জাতি' পোড়াতাম আগুন দিয়ে ॥

এজন্যে লালন শাহের অন্তরঙ্গ শিষ্য-বৃন্দও তাঁর জন্মস্থান, জাতি, গোত্র, বংশ প্রভৃতি বিষয়ে অবহিত ছিলেন না। ফলে, লালন শাহের পূর্ণাংগ ও প্রামাণিক জীবন-কথা রচনা করা আয়াস-সাধ্য।

পূর্ণ জীবন-কাহিনী সংবলিত লালন শাহের কোনো আত্ম-জীবনীমূলক রচনার সন্ধান পাওয়া না গেলেও তাঁর প্রিয়তম শিষ্য দুদ্দু শাহের স্বহস্ত-লিখিত লালন-জীবনী-বিষয়ক একটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। উক্ত পাণ্ডুলিপিতে লেখক জানিয়েছেন—

"ধন্য ধন্য মহামানুষ দরাল লালন সাই
পতিত জনার বন্ধু তাঁর গুণ গাই ॥
.....
আমার দরাল মুরশীদ কৃপা প্রকাশিয়া
তাঁর আত্মকথা কিছু গিয়াছে বলিয়া।
....
বহুদিন সেই কথা রাখিনু ঢাকিয়া
সাইজীর ছিল মানা নাহি প্রকাশিবা।
নাহি জানি কবে আমি যাইব চলিয়া
তাঁর আত্মকথা যাইবে গোপন হইয়া।
এ কারণে শেষকালে লঙ্গি তাঁর বাণী
একান্ত বিনয়ে লিখি তাঁর জীবনী ॥[১]

এই পাণ্ডুলিপি, সমকালীন অন্যান্য লিখিত বিবরণ, জনশ্রুতি এবং বর্তমানকালের লেখক-গবেষকগণের আলোচনাই বক্ষ্যমান প্রবন্ধ-রচনার মূল উপকরণ। এ-গুলোর কোন একটিতেই লালন শাহের সম্পূর্ণ জীবনের সন্দেহাতীত তথ্য-বিন্যাস নেই। তুলনায়, দুদ্দু শাহের পাণ্ডুলিপিটি অধিক নির্ভরযোগ্য। কিন্তু উক্ত 'জীবনী'তে বিবৃত সকল ঘটনাই অসংশয়ে গ্রহণ করা যায়না। রচনাটিও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

২

ক. জন্মকাল ॥

লালন ফকীরের গান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রী মতিলাল দাশ লিখেছেন—"তাঁহার জন্মবর্ষ ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ"।[২] এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে গিয়ে তিনি

১। দুদ্দু শাহ্, লালন-জীবনী (পাণ্ডুলিপি), পৃঃ ১। পাণ্ডুলিপি-পরিচিতি পরিশিষ্টে প্রদত্ত হোল।

২। শ্রী মতিলাল দাশ, "লালন ফকিরের গান", মাসিক বসুমতী (১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩শ বর্ষ—শ্রাবণ, ১৩৪১), পৃঃ ৬৩৮।

কুষ্টিয়া বা টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক 'হিতকরী' পত্রিকার একটি ছিন্ন-পত্রের উল্লেখ করে বলেছেন—"ইহাতেই পাই, লালন ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার দেহত্যাগ করেন. তখন তাঁহার বয়স ১১৬ বৎসর ছিল। 'হিতকরী'তে তারিখ দেওয়া নাই, কাজেই কোন সালের কাগজ বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু অন্যত্র হইতে পাই যে, তিনি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মারা যান, তাহা হইলে তাঁহার জন্মবর্ষ ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতেছে।"[৩] উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়, শ্রী মতিলাল দাশ ঠিক 'হিতকরী' অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। অথচ সুনির্দিষ্ট কোন্ সূত্র থেকে তিনি লালনের মৃত্যুর নিশ্চিত তারিখটি পেয়েছেন তারও কোনো উল্লেখ নেই। কাজেই লালন শাহের যে মৃত্যু-বর্ষটি তিনি সঠিক মনে করেছেন, তা' নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নেওয়া যায় না। আর তার ফলেই ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লালন শাহের জন্ম এই সিদ্ধান্ত গুরুত্বহীন।

অন্যদিকে আধুনিক কালের প্রথিতযশা বাউল-দর্শন-গবেষক শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লালন শাহের জন্মকাল নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন—"তাঁহার (লালনের) জন্ম হয় বাংলা ১১৮১ সালে, ইংরেজী ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে।"[৪] এ তারিখটিই বর্তমানে সর্বাধিক প্রচলিত। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত,[৫] মুহম্মদ মনসুর উদ্‌দীন,[৬] ডঃ আনিসুজ্জামান[৭] প্রভৃতি বিদগ্ধ-জন এ-তারিখটিই যথার্থ বলে মনে করেন। এঁদের মধ্যে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ব্যতীত অন্যান্য সবাই শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের

৩। ঐ, পৃঃ ৬৩৮।

৪। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউল গান, ২য় খণ্ড (কলিকাতা, দীপান্বিতা—১৩৬৪), পৃঃ ৮।

৫। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ডঃ মতিলাল দাশ ও শ্রীপীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, লালন-গীতিকা (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৫৮), ভূমিকা পৃঃ ।/০।

৬। মুহম্মদ মনসুরউদ্‌দীন, (i) হারামণি—৫ম খণ্ড (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-১৯৬১), ভূমিকা পৃঃ ১।৷/০।

— ——(ii) হারামণি—৭ম খণ্ড (বাঙ্‌লা একাডেমী, ঢাকা-১৩৭১), পৃঃ ১৮।

— ——(iii) "লালন সঙ্গীতের সূচীপত্র", লোক-সাহিত্য—৩য় খণ্ড (বাঙ্‌লা একাডেমী, ঢাকা, আষাঢ় ১৩৭১), পৃঃ ২০২।

৭। আনিসুজ্জামান, মুসলিমমানস ও বাংলা সাহিত্য (লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা-১৩৭১), পৃঃ ২০২।

"বাংলার বাউল ও বাউল গান"-গ্রন্থটিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের-ই পোষকতা করেছেন। কিন্তু মুহম্মদ মনসুরউদ্‌দীন সাহেবের মতামত একটু বিচিত্র। তিনি ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দকেও লালন শাহের জন্ম-তারিখ বলে উল্লেখ করেছেন।[৮] অথচ আলোচনা দ্বারা এই তথ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার কোনো চেষ্টাই করেননি। আবার "সাহিত্য পত্রিকা"-য় বিনা আলোচনায় তিনি ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দকেও লালন শাহের জন্মবর্ষ বলে নির্দেশ করেছেন।[৯] তথ্য-প্রাপ্তিরও কোনো উৎস-নির্দেশ নেই। বিশেষ লক্ষণীয় যে,১৩৬৫ সালে "সাহিত্য পত্রিকা"-য় তিনি লালন শাহের জন্ম ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করলেও ১৩৭১ সালে বাঙ্‌লা একাডেমী থেকে প্রকাশিত "লোক-সাহিত্য" পত্রিকায় লালন শাহের জন্ম ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর এ মত-পরিবর্তনের সুস্পষ্ট কারণ কোথাও লিপিবদ্ধ হয়নি। কিংবা এ পরিবর্তনের কোনো ধারাবাহিকতাও নেই। সেজন্যেই মুহম্মদ মনসুরউদ্‌দীন সাহেবের নিজস্ব অভিমত বলে কোনো বছরকেই চিহ্নিত করা সম্ভব নয়।

তাছাড়া, "বাংলার বাউল ও বাউল গান-"গ্রন্থে শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন— "হিতকরী" পত্রিকাতে লালনের মৃত্যু সম্বন্ধে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। ঐ সংবাদটিতে আছে যে, লালন ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার দেহত্যাগ করেন।.....'হিতকরী' ১২৯৭ সালের বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইয়া চৈত্র পর্যন্ত কুষ্টিয়াতে ছিল। তাহার পর বৎসর মীর মোশাররফ হোসেনের কর্মস্থল টাঙ্গাইলে উহা স্থানান্তরিত হয়।..... লালনের মৃত্যু-সংবাদ সংবলিত অংশটুকু ঐ ১২৯৭ সালের 'হিতকরী'রই অংশ তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।"[১০] 'হিতকরী'র এই প্রকাশকাল নির্ধারণে শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচিত 'বাংলা সাময়িক পত্র'গ্রন্থের আশ্রয় নিয়েছেন। পত্রিকাটি সম্পর্কে ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান লিখেছেন—"'হিতকরী' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা ১৮৯০ সালের প্রথম দিক থেকে "কুমারখালী মথুরানাথ যন্ত্রে'

৮। মুহম্মদ মনসুর উদ্‌দীন, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ২য় খণ্ড (ঢাকা, ১৩৭১), পৃঃ ১৭।

৯। —— — "লালন ফকীরের গান", (সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৫), পৃঃ ৯৭।

১০। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭।

শ্রীরজনীকান্ত ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত" এবং কুষ্টিয়া লাহিনীপাড়া, শ্রীদেবনাথ বিশ্বাস কর্তৃক প্রকাশিত হচ্ছিল। পত্রিকার অতি জীর্ণ যে কটি সংখ্যা আমি পেয়েছি তার একটি প্রকাশ হয়েছিল ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বরে, প্রথম ভাগ—১৭শ সংখ্যা হিসেবে। কাজেই অনুমান করি, ঐ বছরের এপ্রিল থেকে পত্রিকাটি প্রকাশ হতে থাকে।"[১১] এই বক্তব্যের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশিত 'হিতকরী'র প্রকাশকালগত ঐক্য আছে।[১২] তাহলে 'হিতকরী'র ১৭ই অক্টোবর যে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দেরই ১৭ই অক্টোবর সে সম্পর্কে সন্দেহ করা অসমীচীন। অতএব লালনের বয়স ১১৬ বছর এই সিদ্ধান্ত যথার্থ হলে, তাঁর জন্মবর্ষ সম্পর্কে শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের নির্দেশিত তারিখটি স্বীকার করতে হয়।

কিন্তু মৌলভী আবদুল ওয়ালী সাহেব তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন, "...**he (Lalan Shah) died some ten years ago.**"[১৩] উল্লেখযোগ্য যে, যদিও জনাব ওয়ালী সাহেবের প্রবন্ধটি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের নৃতত্ত্ব-সমিতির মুখপত্রে প্রকাশিত হয়, তথাপি "লেখাটি উল্লিখিত সোসাইটির সাধারণ সভায় পঠিত হয়েছিলো ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর, বুধবারে।"[১৪] তাহলে দেখা যায়, মরহুম ওয়ালী সাহেবের সাক্ষ্যে লালন শাহের মৃত্যুবর্ষ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ, বাঙ্‌লা ১২৯৫ সাল। লালন-শিষ্য দুদ্দু শাহের বর্ণনায়ও এই তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায়। দুদ্দুর রচনাটিও মরহুম আবদুল ওয়ালী সাহেবের রচনার পূর্ববর্তী।

১১। কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ১ম খণ্ড (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৬৮ সাল) পৃঃ ২৫২।

১২। উদ্ধৃত, শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকৃত প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৭।

১৩। Maulavi Abdul Wali. "On Curious Tenets and practices of a Certain Class of Faqirs of Bengal." The Journal of the Anthropological Society of Bombay (Vol. V, No 4, Bombay, 1900), p. 217.

১৪। মোহাম্মদ শরীফ হোসেন, "লালন শাহের জন্মস্থান" দৈনিক ইত্তেফাক, রবিবাসরীয় সংখ্যা, ৮ই মাঘ, ১৩৬৭। ইনিই প্রথম প্রবন্ধটির প্রতি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

দুদ্দু শাহ্ লিখেছেন,

বারশত পঁচানব্বই বাঙ্গালা সনেতে
১লা কার্ত্তিক শুক্রবার দিবা অন্তে ॥
সবারে কাঁদায়ে মোর প্রাণের দয়াল
ওফাৎ পাইল মোদের করিয়া পাগল।[১৫]

দুদ্দু শাহ্ লালনের সর্বাপেক্ষা প্রিয় শিষ্য ছিলেন। স্নেহাধিক্যবশত তিনি তাঁকে 'বাবা' বলে ডাকতেন। লালন শাহের ওফাতের সময় দুদ্দু শাহ্ তাঁর মৃত্যু-শয্যাপার্শ্বে বিদ্যমান ছিলেন। তাছাড়া পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, দুদ্দু শাহ্ লালন শাহের মুখ থেকে তাঁর জীবন-কথা শুনে তা' লিপিবদ্ধ করেছেন। সর্বোপরি দুদ্দু শাহ্ লালন শাহের যে জীবন-কালের উল্লেখ করেছেন তা'ও 'হিতকরী'র উল্লেখের সঙ্গে অভিন্ন। অথচ তিনি 'হিতকরী' বা অন্য কোনো পত্রিকার সহায়তায় লালন-জীবনী রচনা করেননি। এমতাবস্থায় দুদ্দু শাহের উল্লিখিত মৃত্যুবর্ষটিই সঠিক মনে হয়। অর্থাৎ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার তথা বাঙ্‌লা ১২৯৫ সালের ১লা কার্তিক লালন শাহের জীবনাবসান ঘটে।

তাহলে তাঁর জন্মবর্ষ সম্পর্কে শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের নির্দিষ্ট তারিখ গ্রহণ করা যায়না। কারণ লালন শাহের আয়ুষ্কাল ১১৬ বছর—এই তথ্য অভ্রান্ত হলে তার জন্মবর্ষ নিরূপিত হয় (১৮৮৮ – ১১৬ =) ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ। দুদ্দু শাহের উল্লিখিত জন্মবর্ষের সঙ্গেও এই হিসেবের ঐক্য আছে। তিনি স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন,

এগার শো উনআশী কার্ত্তিকের পহেলা।
হরিষরপূ গ্রামে সাইর আগমন হইলা ॥[১৬]

অর্থাৎ দুদ্দু শাহের বর্ণনা-অনুসারেও ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দেই লালন শাহের জন্ম হয়।

অবশ্য অপর লালন-জীবনী রচয়িতা অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম বলেছেন, লালন শাহের জীবনকাল ১২৪ বছর এবং তাঁর "জন্ম-তারিখ ১৭৬৮।"[১৭] এই

১৫। দুদ্দু শাহ্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪।
১৬। ঐ, পৃঃ ১।
১৭। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম, বাউল কবি লালন শাহ্ (সাহিত্য নিকেতন, কুষ্টিয়া, ১৯৬৩), পৃঃ ১৪।

সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন যুবক তখন তাঁর সাথে লালন শাহের পরিচয়। লালন শাহের বয়স তখন এক শ বছরেরও বেশী। ···রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন ইং ১৮৬১ সালে অর্থাৎ লালন ফকিরের জন্মের প্রায় ৯৪ বছর পরে। রবীন্দ্রনাথ যখন কুষ্টিয়ায় জমিদার হিসাবে আসেন তখন তিনি পূর্ণ যুবক। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় এবং মনসুরউদ্দিন সাহেবের যুক্তি অনুযায়ী আমরা দেখি লালন শাহ্ ১১৬ জীবিত ছিলেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় লালন শাহের ৮৭ বৎসর বয়সে। বিভিন্ন সাহিত্যিক লালনের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে এমন মনগড়া তথ্য পরিবেশন করেছেন তাতে সব কিছু জটিলতর আকার ধারণ করেছে। যা'হোক আমাদের হাতে কোন দলিল না থাকায় আমরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারছিনা। তবে মোটামুটি ভাবে এই বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু বছর ধরে লালন শাহের সাহচর্যে ছিলেন। এমতাবস্থায় যদি রবীন্দ্রনাথের জন্মের ২৯ বৎসর পর লালন শাহের মৃত্যুদিন ধরি তবে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ খুব বেশীদিন তাঁর সঙ্গ পাননি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে এ ধারণা ঠিক নয়। এ অবস্থায় আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ৩৫ বৎসর তখন তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। যা'হোক ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের যে কোন এক সালকে আমরা লালন শাহের জন্মের সাল হিসাবে ধরে নিতে পারি। মৃত্যুর তারিখ নিয়ে উপরোল্লিখিত সুধীবর্গের মধ্যে খুব বেশী অমিল নেই। সুতরাং আমরা তাঁর মৃত্যুর সাল ১৮৯২ ইং হিসেবে ধরে নিতে পারি। তাহলে লালন শাহের জন্মতারিখ ১৭৬৮ এবং মৃত্যুর তারিখ ১৮৯২ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। এই হিসাবে লালনের বয়স ১২৪ বৎসরের কাছাকাছি পড়ে। লালন শাহের অনেক শিষ্যের মতও এই।"[১৮]

বলা বাহুল্য, লালন শাহের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ নির্ধারণ করতে গিয়ে অধ্যাপক সাহেব উপরোক্ত যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে যে পণ্ডশ্রম করেছেন, তা ভিত্তিহীন। কারণ তিনি রবীন্দ্রনাথ ও লালন শাহের কাল্পনিক ও অবাস্তব সাক্ষাৎকারের উপর বেশী জোর দেওয়ায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম লালনের প্রকৃত জন্মতারিখ নির্ধারণ করতে গিয়ে

১৮। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩-১৪

রবীন্দ্র-লালন-সাক্ষাৎ-বৃত্তে পড়ে এমনি ভাবে লক্ষ্যচ্যুত হয়েছেন যে, হিতকরী-পত্রিকায় প্রদত্ত তথ্যকেও শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও জনাব মনসুরউদ্দীন সাহেবের মনগড়া তথ্য বলতে দ্বিধা করেননি। অথচ রবীন্দ্র-লালন সাক্ষাৎকারের যে কেন্দ্রে তিনি এত নির্ভর করেছেন তার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালন শাহের কখনো সাক্ষাৎ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে অল্প কিছুদিনের জন্য প্রথম ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে (বাঙ্‌লা ১২৯৪ সাল) আগমন করেন। তারপর স্থায়ীভাবে তিনি শিলাইদহে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ (বাঙ্‌লা ১২৯৮ সাল) থেকে অবস্থান করা শুরু করেন। লালন শাহ্‌ তার তিন বছর পূর্বে পরলোক প্রাপ্ত হন।

তাহলে, লালনের জীবৎকাল ১২৪ বছর, এ তথ্য নিশ্চিতই ভুল। তৎ নির্দিষ্ট জন্ম-মৃত্যুর তারিখও সঠিক নয়। কারণ অধ্যাপক সাহেবের প্রদত্ত জন্ম-মৃত্যুর কোনো তারিখের সঙ্গেই প্রত্যক্ষদর্শী দুদ্দু শাহের প্রদত্ত বিবরণের কিংবা 'হিতকরী'র উল্লেখের কোনো ঐক্য নেই। তিনি নিজেও তাঁর বক্তব্যকে যথেষ্ট শক্তিশালী ভিত্তি দান করতে পারেননি।

প্রাগুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাঙ্‌লা ১১৭৯ সালের ১লা কার্তিক (১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর) শুক্রবার লালন শাহ্‌ জন্মগ্রহণ করেন এবং বাঙ্‌লা ১২৯৫ সালের ১লা কার্তিক (১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর) শুক্রবারে তাঁর মৃত্যু হয়। লালনের প্রকৃত আয়ুষ্কাল ১১৬ বছর।

খ. জন্মস্থান।

লালন শাহের জন্মস্থান সম্পর্কে শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন—"পূর্বতন নদীয়া জেলার (বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের কুষ্টিয়া জেলা) কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত কুমারখালি থানার অধীন কুষ্টিয়া হইতে চার-পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব কোণে গোরাই নদীর তীরবর্তী ভাঁড়ারা গ্রামে লালনের জন্ম হয়।"[১৯] সম্ভবত বর্ণনাটি তিনি শ্রীবসন্তকুমার পালের "ফকির লালন সাহ" শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে সংগ্রহ করেছেন। কারণ লালন-জীবনী রচনা করতে গিয়ে শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লালন শাহ্‌ "সম্বন্ধে লোকমুখে যাহা শোনা যায়" তার সঙ্গে ব্যক্তিগত জ্ঞান

১৯। শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬।

ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটিয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন।[২০] আর শ্রীবসন্তকুমার পাল বলেছেন—"ভাঁড়ারা বা ভাণ্ডারিয়া গ্রামে যে স্থানে দুঃখী সেখ চৌকিদার বাড়ী করিয়া আছে, ঠিক সেই স্থানেই সাঁইজির জননী শেষ-জীবন অতিবাহিত করিয়া যান। ··সাঁইজি যে এই গ্রামেরই লোক তাহা প্রায় সকলেরই জানা আছে।"[২১] এ থেকে বোঝা যায় লালন শাহ্ এক সময় কুষ্টিয়া জেলার ভাঁড়ারা গ্রামে দীর্ঘদিন অবস্থান করেছেন। কিন্তু দীর্ঘদিন কোনো স্থানে বসবাস করলেই যে সেটি নিঃসন্দেহে জন্মস্থান বলে গ্রহণ করতে হবে—এমন নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে শ্রীবসন্তকুমার পাল ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মূল বক্তব্যের সঙ্গে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন[২২], আনিসুজ্জামান[২৩], মুহম্মদ আবদুল হাই[২৪], ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত[২৫] প্রভৃতি খ্যাতনামা প্রায় সকল পণ্ডিত একমত। বাউলদের বিষয়ে আলোচনার অন্যতম পথিকৃৎ ক্ষিতিমোহন সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত লীলা-বক্তৃতায় বলেছিলেন—"লালনের স্থান ছিল কুষ্টিয়ার নিকট।"[২৬] অবশ্য এই "স্থান" জন্মস্থান না কর্মস্থান সে বিষয়ে তিনি স্পষ্টতঃ কিছু বলেননি। কাজেই এ বক্তব্য অস্পষ্ট। আর শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সিদ্ধান্ত যদি মৌলিক হয় তবে তা সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্যভিত্তিক না হওয়ায় অসংশয়ে বিশ্বাস করা চলেনা। কারণ অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম বলেছেন—"হরিশপুরের ১২০ বৎসর বয়স্ক আহাদ আলী মণ্ডল, মুন্‌শী আবদুল আজিজ প্রভৃতি প্রবীণদের উক্তিতে জানা যায় লালনের বাড়ী হরিশপুরে।"[২৭]

২০। ঐ, পৃঃ ৬।

২১। শ্রীবসন্তকুমার পাল, "ফকির লালন সাহ" প্রবাসী (১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, ২৫শ ভাগ, শ্রাবণ ১৩৩২), পৃ ৪৯৮।

২২। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, বা-সা-মু-সা, পৃঃ ১৭।

২৩। আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০২। পূর্বোক্ত

২৪। মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহ্সান সম্পাদিত, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা ১৩৭১, পৃঃ ।০

২৫। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ।৵০

২৬। ক্ষিতিমোহন সেন, বাংলার বাউল (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৫৪), পৃঃ ৫৬।

২৭। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২।

লোক-বিশ্বাস ব্যতীত এ-ধারণার সমর্থনে তিনিও দ্বিতীয় কোনো তথ্য বা যুক্তির অবতারণা করেননি। এমন একটি ধারণা যে লালনের কোনো কোনো শিষ্য পোষণ করতেন তার প্রমাণ শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের গ্রন্থেও পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন—"সিরাজ সাঁই সম্বন্ধে ও সেই সঙ্গে লালনের সম্বন্ধে অন্য অঞ্চল হইতে আর একটি কথাও শোনা যায়। সিরাজ যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহাকুমার অন্তর্গত হরিশপুর গ্রামের পাল্কী বাহক ছিলেন।"[২৮] শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এ-তথ্যকে যাচাই করে দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। বরং বলেছেন, "নানা কারণে এই বিবরণটি মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।"[২৯] কারণ-গুলো তিনি উল্লেখ করেননি। হয়তো লোক-শ্রুতি বলেই এ-তথ্যকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষণ করতে ইচ্ছা করেননি।

কিন্তু লোক-বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে, ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম বর্তমান প্রবন্ধকার কর্তৃক আবিষ্কৃত বাউলগানের অতিপুরাতন একটি খাতায় লিপিবদ্ধ লালন-পরিচিতির মধ্যে এ-তথ্যের লৈখিক সমর্থন পাওয়া যায়। উক্ত পরিচিতির পরিচয় দান করতে গিয়ে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সাহেব তাঁর 'হারামণি',৭ম খণ্ডের খ-পরিশিষ্টের পাদটীকায় লিখেছেন—"সম্প্রতি বাঙ্‌লা একাডেমীর লোক-সঙ্গীত সংগ্রাহক···লুৎফর রহমান···একটি খবর সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। ···এই খবর অনুযায়ী পাওয়া যায় "লালন শাহ্ ফকির" সাকিন হরিশপুর, জেলা যশোহর";···। আশা করা যায়, গবেষকগণ এই খবরের সত্যাসত্য বিচার করিয়া দেখিবেন।"[৩০] এই বিচারে দেখা যায় পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত দুদ্দু শাহের পাণ্ডুলিপিতেও বলা হয়েছে,

এগার শো ঊনআশী কার্ত্তিকের পহেলা।
হরিষপূর গ্রামে সাইর আগমন হইলা॥
যশোহর জেলাধীন ঝিনাইদহ কয়
উক্ত মহকুমাধিন হরিষপূর হয়॥[৩১]

মরহুম মৌলবী আব্দুল ওয়ালী সাহেবের প্রবন্ধেও পাওয়া যায়,

২৮। শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।
২৯। ঐ, পৃঃ ৯।
৩০। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, হা. ম.—৭ম খণ্ড, পৃঃ খ-পরিশিষ্টের'খ'।
৩১। দুদ্দু শাহ্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১।

Another renowned and the most melodious versifier, whose "dhuyas" are the rage of the lower classes, and sung by boatmen and others, was the far famed "Lalan shah". He was a disciple of "Siraj shah" and both were born at the Village Harishpur, Sub-division Jhenidah, District Jessore."[৩২]

তাছাড়া হরিশপুর গ্রামে লালন শাহের একজন বংশধর এখনও জীবিত রয়েছেন। ইনি ছবিরণ নেছা বিবি ওর্ফে 'ক্ষেপুর মা'। এই 'ক্ষেপুর মা' লালন শাহ্‌দের বংশের চতুর্থ সিঁড়ির কন্যা।[৩৩]

অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায়, লালন শাহের জন্মভূমি যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহাকুমার হরিশপুর গ্রাম। অধ্যাপক আফসার উদ্দীন সেখ-এর মতে লালন শাহ্‌ এই গ্রামের "উত্তর পাড়ায়" জন্মগ্রহণ করেন।[৩৪]

গ. 'জাতি' ও বংশ-পরিচয়॥

কিন্তু তিনি কোন্‌ 'জাতি' বা সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন অথবা তিনি নিজে কোন্‌ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সে বিষয়ে লালন শাহের জীবৎকালেই প্রশ্ন উঠেছিল। একাধিক লালন-গীতিতে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিদ্যমান। সমকালীন জনসাধারণের এ-কৌতূহলকে কেন্দ্র করে লালন শাহ্‌ তাঁর জাতি-ধর্ম-বর্ণ সম্পর্কে স্বমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু কোথাও পরিষ্কাররূপে আত্মোন্মোচন করেননি। কারণ বিশ্ব-মানবতার প্রবক্তা লালন শাহ্‌ মানব-জাতির অন্য কোনো বিভাগ-উপবিভাগের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন না। গোত্র-বর্ণ-সম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁর এ শ্রদ্ধাহীনতা নিছক ভাবাবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলনা। জনসাধারণের আজন্ম শ্রদ্ধেয় এসব সংস্কার ও তার আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত যুক্তি-সংগত-ভাবেই ন্যায়ারোপণ করে বলেছেন,

সব লোকে কয়
লালন কি জাত সংসারে।

৩২। Maulavi Abdul Wali, ibid., p. 217

৩৩। অধ্যাপক আফ্‌সার উদ্দীন সেখ, "লালন জীবন জিজ্ঞাসার এক অধ্যায়," কুষ্টিয়া কলেজ বার্ষিকী (কুষ্টিয়া, ১৯৬৪), পৃঃ ১১৯।

৩৪। ঐ, পৃঃ ১২০।

লালন বলে জাতির কি রূপ
দেখলাম না তা'—নজরে ॥

ছোন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারী লোকের কি হয় বিধান
বামন চিন পৈতা প্রমাণ
বাম্‌নি চিনি—কিসে রে ॥

কেউ মালা কেউ তস্‌বি গলে
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলে
আসা কিম্বা যাওয়ার কালে
জাতির চিহ্ন রয় কি রে ॥

জগৎ বেড়ে জাতির কথা
জাতির গৌরব যথা-তথা
লালন বলে জাতির 'ফাতা'
ডুবিয়েছি—সাধ্‌-বাজারে ॥

উদ্ধৃত কবিতায় লালন শাহ্‌ হিন্দু-মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যমূলক আচার-অনুষ্ঠানের অসারতার প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছেন। সেজন্যে লালন শাহ্‌ "জাতির ফাতা" ফোতা (<পতাহ্‌ = ঠিকানা) "সাধ-বাজারে" অর্থাৎ ইচ্ছে করেই লুপ্ত করে দিয়েছেন।

কিন্তু এ জবাবেও তিনি রেহাই পাননি। বারে বারে তাঁকে এ-প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। জবাব দিতে হয়েছে। তিনিও একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নটির মীমাংসা করেছেন। যেমন,

জাতির উৎপত্তি কোথায় ?
সকলে শুধায়—
বললে কবে লালন ফকীর
কড়া কথা কয় ?

আদিকালে আদমগণ
নানান জায়গায় করত ভ্রমন
ভিন্ন আচার ভিন্ন বিচার
তাইতে সৃষ্টি হয়।

জানত না কেউ কারো খবর
ছিলনা এমন কলি জবর
এক এক দেশে ক্রমে শেষে
গোত্র সৃষ্টি পায়॥

জ্ঞানী-দিগ্বিজয়ী হোল
নানা রূপ সব দেখতে পেল
দেখে নানা রূপ সব হোল বেকুব
এরূপে জাতির পরিচয়॥

খগোল ভূগোল নাহি জানত
যার যার কথা সেই বলিত
লালন বলে কলিকালে
জাত বাঁচানো দায়॥

এ কবিতায় লালন শাহ্ ঐতিহাসিক-নৃতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে জাতিতে-জাতিতে ভেদাভেদ ও আচার-অনুষ্ঠানের বিভিন্নতার বিচার করেছেন। ন্যায়ারোপণের এই অবরোহ-পদ্ধতিতে তিনি 'জাতি'-তত্ত্বের বিশ্লেষণ করে মানুষের সংকীর্ণ জাত্যাভিমান-(**Racial Chauvenism**)কে কূপমণ্ডুকের অহমিকা বলে নির্দেশ করেছেন এবং এর ভবিষ্যৎ-বিনাশের প্রতিও ইঙ্গিত দান করেছেন।

কিন্তু লালন শাহ্ নিজে এসব ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি আস্থাশীল না হলেও এসবে যাঁরা আস্থাবান তাঁদের কোনো এক বংশেই তাঁর জন্ম—এমন নিশ্চয় হতে পারে। আর সে দিক থেকে বিচার করতে গেলে লালন শাহের জন্মগত-উত্তরাধিকার কোন্ জাতির তা নির্ধারণ করা সম্ভব। অতএব এদিক থেকে লালনের নিজের বক্তব্য কি এ-প্রসঙ্গে তা জানা আবশ্যক। লালন বলেছেন,

এবিষয়ে কোনো মৌলিক তথ্য বা যুক্তির অবতারণা করেননি। অবশ্য মনসুর উদ্দীন সাহেব লালন শাহের বংশ-পরিচয় দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে কিছুটা ভিত্তি দেবার চেষ্টা করেছেন। বংশ-পরিচয়ের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন—লানন শাহ্ হিন্দু-সন্তান। নাম লালন চন্দ্র রায়, মতান্তরে লালবিহারী দে। পিতার নাম ভস্মদাস, মাতা পদ্মাবতী।"[৪৩]

উল্লেখযোগ্য যে, লালন শাহের বংশ-পরিচয় সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীবসন্তকুমার পাল বলেছিলেন-"সাঁইজী কায়স্থ-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ...সাঁইজীর জননীর নাম পদ্মাবতী এবং মাতামহের নাম ভস্মদাস। ...সাঁইজীর বাল্য নাম লালন দাস।"[৪৪] এখানে শ্রীবসন্তকুমার পাল ভস্মদাসকে লালন শাহের মাতামহ বলে শনাক্ত করেছেন; কিন্তু মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সাহেব তাঁকে পিতা বলে বর্ণনা করেছেন। এবং উভয়েরই তথ্য আহরণের উৎস লালন সাঁই মতবাদী ফকীরদের জবানী। একই প্রবন্ধে বসন্তকুমার বাবু নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, "সাঁইজী হিন্দু কি মুসলমান একথা আমিও স্থির বলিতে অক্ষম; এমনকি তিনি নিজেও বলিয়াছেন—"সবাই বলে লালন ফকির হিন্দু কি যবন।" —তবে মুসলমানের হস্তে প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিতেন এই অপরাধে তাঁহাকে মুসলমান বলিয়া সাব্যস্ত করা যায়।"[৪৫] কিন্তু বসন্তবাবু লালনের উক্ত "সবে বলে লালন ফকির হিন্দু কি যবন" গানটি সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করলে এ-বিষয়ে সুনিশ্চিত একটি ইংগিত আবিষ্কার করতে পারতেন। গানটি নিম্নরূপ ঃ

সবাই শুধায় লালন ফকীর
হিন্দু কি যবন।
কারে বা বলব আমি
না জানি সন্ধান॥

৪৩। মুহম্মদ আবু তালিব, "লালন শাহ্" দৈনিক ইত্তেফাক (সাপ্তাহিক সাময়িকী—১লা মাঘ, ১৩৬৭),—এ উদ্ধৃত।

৪৪। শ্রী বসন্তকুমার পাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯৮।

৪৫। শ্রী বসন্তকুমার পাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০১-৫০২।

আদিকালে আদমগণ
নানান জায়গায় করত ভ্রমন
ভিন্ন আচার ভিন্ন বিচার
তাইতে সৃষ্টি হয়।

জানত না কেউ কারো খবর
ছিলনা এমন কলি জবর
এক এক দেশে ক্রমে শেষে
গোত্র সৃষ্টি পায়॥

জ্ঞানী-দিগ্বিজয়ী হোল
নানা রূপ সব দেখতে পেল
দেখে নানা রূপ সব হোল বেকুব
এরূপে জাতির পরিচয়॥

খগোল ভূগোল নাহি জানত
যার যার কথা সেই বলিত
লালন বলে কলিকালে
জাত বাঁচানো দায়॥

এ কবিতায় লালন শাহ্ ঐতিহাসিক-নৃতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে জাতিতে-জাতিতে ভেদাভেদ ও আচার-অনুষ্ঠানের বিভিন্নতার বিচার করেছেন। ন্যায়ারোপণের এই অবরোহ-পদ্ধতিতে তিনি 'জাতি'-তত্ত্বের বিশ্লেষণ করে মানুষের সংকীর্ণ জাত্যাভিমান-(**Racial Chauvenism**)কে কূপমণ্ডুকের অহমিকা বলে নির্দেশ করেছেন এবং এর ভবিষ্যৎ-বিনাশের প্রতিও ইঙ্গিত দান করেছেন।

কিন্তু লালন শাহ্ নিজে এসব ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি আস্থাশীল না হলেও এসবে যাঁরা আস্থাবান তাঁদের কোনো এক বংশেই তাঁর জন্ম—এমন নিশ্চয় হতে পারে। আর সে দিক থেকে বিচার করতে গেলে লালন শাহের জন্মগত-উত্তরাধিকার কোন্ জাতির তা নির্ধারণ করা সম্ভব। অতএব এদিক থেকে লালনের নিজের বক্তব্য কি এ-প্রসঙ্গে তা জানা আবশ্যক। লালন বলেছেন,

সবাই শুধায় লালন ফকীর
কোন জাতির ছেলে।
কারে বা কি বলব আমি
দিশা না মেলে॥

হয় কেমনে জাতির প্রমাণ
হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্ট-যবন?
'জাত' বলিতে কি হয় বিধান
শাস্ত্রে খুঁজিলে? ॥

স্বেদ-অণ্ড-জরায়ু ধরে
এক-একেশ্বর সৃষ্টি করে
আগম-নিগম চরাচরে
তারে ভিন্ন জাত বলে? ॥

মানুষের কি হয় জাতির বিচার?
এক এক দেশে এক এক আচার
লালন কয় জাতির ব্যবহার
গিয়াছি ভুলে॥

এ কবিতায়ও লালন শাহ্ তাঁর জাতি বিশ্বাস সম্পর্কীয় পূর্ব ধারণাকেই অটুট রেখেছেন। কারণ পিতামাতার জাতি-পরিচয় প্রদানও এক দিক থেকে জাতি-ধর্মে আস্থা স্থাপনের পরিচায়ক। কিন্তু যিনি মানব-ধর্মে বিশ্বাসী, মানুষের কখনো জাতি-বিচার সম্ভব নয় বলে যাঁর ধারণা---তিনি এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন না। এ-কবিতায়ও তাই লালন শাহ্ ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে স্বমত ব্যক্ত করেছেন। কবিতাটিতে তিনি প্রজনন-বিজ্ঞানের যুক্তি অবতারণা করে বলেছেন রমণীর জরায়ুতে যখন একই উপায়ে শুক্রকীট ও ডিম্বাণুর সংযোগে মানব-শিশুর জন্ম হয়, তখন সে-মানুষের গোত্র-বিচার নিরর্থক।

লালন শাহের জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বাচন তাই সেকালের ন্যায় একালেও অত্যন্ত দুরূহ। তবু অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এ বিষয়ে শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

বলেছেন, "লালন জাতিতে হিন্দু কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল কর, কেহ কেহ বলে দাস।"[৩৫] অবশ্য লালন কায়স্থ-সন্তান, শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের এই তথ্য, লালন-শিষ্য ফকীরদের নিকট থেকে সংগৃহীত। আর এ-ধারণাটি লালনের জীবিতাবস্থায়ই প্রচলিত ছিল। তার প্রমাণ মৌলভী আবদুল ওয়ালী সাহেবের প্রবন্ধেও পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন—"**Here (At Siuarya) he lived, feasted, sang and worshipped and was known as Kayastha.**'[৩৬] কিন্তু লোক-বিশ্বাস-নির্ভর এ-তথ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়। এ বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে শ্রীমতিলাল দাশ তাঁর ১৩৪১ সালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লালনের "মুরশিদ বিনে কি ধন আর আছে রে মন এ জগতে" গানটি উদ্ধৃত করে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছেন, "এই কবিতায় মুসলমান ধর্ম্মের অনেক রীতি-নীতির উল্লেখ আছে—কিন্তু লালন মুসলমান ছিলেন বলিলে ভুল হইবে। ...লালন ফকির হওয়ার পূর্বে হিন্দু ছিলেন এবং পরে সিরাজ সাঁই দরবেশের নিকট দীক্ষিত হন। ...কিন্তু আসলে তিনি মুসলমান নন।"[৩৭] কারণ স্বরূপ শ্রীমতিলাল দাশ বলেছেন, "তাঁহার সাধনায় নামাজের স্থান নাই।"[৩৮] বলা বাহুল্য, এ অত্যন্ত দুর্বল যুক্তি। আর লালন শাহের সাধন-পদ্ধতির তিনি কোনো উল্লেখই করেননি। তাছাড়া ফকীর হওয়ার পূর্বে লালন হিন্দু ছিলেন এবং পরে মুসলমান হন—সে-সম্পর্কেও কোনো সুস্পষ্ট তথ্য-নির্দেশ করেননি।

লালন জন্মতঃ হিন্দু এবং পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করেন। এ-বক্তব্যের সঙ্গে ক্ষিতিমোহন সেন[৩৯], ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত[৪০], মুহম্মদ মনসুর উদ্‌দীন[৪১], আনিসুজ্জামান[৪২] প্রভৃতি পণ্ডিত একমত। কিন্তু এঁরা কেউ-ই

৩৫। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।

৩৬। Moulavi Abdul Wali, Ibid., p. 217.

৩৭। শ্রীমতিলাল দাশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩৮।

৩৮। ঐ, পৃঃ ৬৩৮।

৩৯। শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬।

৪০। শ্রী শশিভূষণ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত, ভূমিকা পৃঃ ।/০।

৪১। মুহম্মদ মনসুর উদ্‌দীন, হা. ম.—৫ম খণ্ড, পৃঃ ॥৶০

৪২। আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০২

এবিষয়ে কোনো মৌলিক তথ্য বা যুক্তির অবতারণা করেননি। অবশ্য মনসুর উদ্দীন সাহেব লালন শাহের বংশ-পরিচয় দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে কিছুটা ভিত্তি দেবার চেষ্টা করেছেন। বংশ-পরিচয়ের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন—লানন শাহ্ হিন্দু-সন্তান। নাম লালন চন্দ্র রায়, মতান্তরে লালবিহারী দে। পিতার নাম ভস্মদাস, মাতা পদ্মাবতী।"[৪৩]

উল্লেখযোগ্য যে, লালন শাহের বংশ-পরিচয় সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীবসন্তকুমার পাল বলেছিলেন-"সাঁইজী কায়স্থ-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ...সাঁইজীর জননীর নাম পদ্মাবতী এবং মাতামহের নাম ভস্মদাস। ...সাঁইজীর বাল্য নাম লালন দাস।"[৪৪] এখানে শ্রীবসন্তকুমার পাল ভস্মদাসকে লালন শাহের মাতামহ বলে শনাক্ত করেছেন; কিন্তু মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সাহেব তাঁকে পিতা বলে বর্ণনা করেছেন। এবং উভয়েরই তথ্য আহরণের উৎস লালন সাঁই মতবাদী ফকীরদের জবানী। একই প্রবন্ধে বসন্তকুমার বাবু নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, "সাঁইজী হিন্দু কি মুসলমান একথা আমিও স্থির বলিতে অক্ষম; এমনকি তিনি নিজেও বলিয়াছেন—"সবাই বলে লালন ফকির হিন্দু কি যবন।" —তবে মুসলমানের হস্তে প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিতেন এই অপরাধে তাঁহাকে মুসলমান বলিয়া সাব্যস্ত করা যায়।"[৪৫] কিন্তু বসন্তবাবু লালনের উক্ত "সবে বলে লালন ফকির হিন্দু কি যবন" গানটি সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করলে এ-বিষয়ে সুনিশ্চিত একটি ইংগিত আবিষ্কার করতে পারতেন। গানটি নিম্নরূপ ঃ

সবাই শুধায় লালন ফকীর
হিন্দু কি যবন।
কারে বা বলব আমি
না জানি সন্ধান॥

৪৩। মুহম্মদ আবু তালিব, "লালন শাহ্" দৈনিক ইত্তেফাক (সাপ্তাহিক সাময়িকী—১লা মাঘ, ১৩৬৭),—এ উদ্ধৃত।

৪৪। শ্রী বসন্তকুমার পাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯৮।

৪৫। শ্রী বসন্তকুমার পাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০১-৫০২।

বেদ-পুরাণে করেছে জারী
যবনের শাঁই হিন্দুর হরি
তাও তো আমি বুঝতে নারি
দুই রূপ সৃষ্টি করলেন—
তার কি প্রমাণ ॥

একই পথে আসা-যাওয়া
একই পাটনী দিচ্ছে খেওয়া
কেউ খায়না কারো ছোঁওয়া
ভিন্ন জল কে কোথায় পান ॥

বিবিদের নাই মুসলমানি,
পৈতে যার নাই সেও তো বাম্‌নি
(বোঝা রে ভাই দিব্যজ্ঞানী)
লালন তেম্‌নি—
খাত্‌নার জাত একখান ॥

লক্ষণীয় যে, আলোচ্য গানটির শেষ পংক্তিতে লালন শাহ্‌ আত্ম-পরিচয়ের রহস্য-উন্মোচন না করেও কিঞ্চিৎ পরিহাসের সুরে নিজেকে 'খত্‌নার-জাত' বলে উল্লেখ করেছেন। 'খত্‌না'-প্রথা একমাত্র ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যেই প্রচলিত। তাহলে কি লালন মুসলিম-সন্তান ছিলেন ?

অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম বলেছেন, "লালন শাহ্‌ ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। তাঁর সমগ্র জীবন ইস্‌লামের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল।"[৪৬] তাঁর এই সিদ্ধান্তের মূলে কোনো তথ্য-নির্দেশ নেই। শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের একটি উক্তির প্রতিবাদ করতে গিয়ে জনাব করিম সাহেব উপর্যুক্ত উক্তি করেছেন।

শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মূল বক্তব্যটি ছিল মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সাহেবের একটি উক্তির সমালোচনা। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সাহেব বলেছেন, লালন "স্বেচ্ছায় ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করেন।"[৪৭] এ বক্তব্যের সমালোচনা প্রসংগে শ্রী

৪৬। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।
৪৭। শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২, উদ্ধৃত।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন—"লালনের ধর্ম কি ইস্‌লাম ধর্ম? লালন-গুরু সিরাজ সাঁই মুসলমান হইলেও ধর্মে কি ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন? তাঁহাদের ধর্ম ফকিরি ধর্ম—আউল-বাউলের ধর্ম-জাতি-ধর্ম-সংস্কার নির্বিশেষে একটা নির্দিষ্ট সাধনমার্গের ধর্ম।"[৪৮] এই উক্তির সমালোচনা করে অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম বলেছেন—"উপেন বাবু ইস্‌লাম ও মুসলমান এই দুইটি শব্দের ভিতর পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। অথচ এদের মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই। স্রষ্টার নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করাই ইস্‌লাম, আর যে ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করে সে মুসলমান। সুতরাং ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বী ও মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ···ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বীদের প্রতি উপেন বাবুর আক্রোশ নিছক ব্যক্তিগত বলে আমি মনে করি।"[৪৯] অতঃপর তিনি লালন শাহ্‌ ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন—এই উক্তি করেছেন।

উল্লেখযোগ্য যে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ সম্পর্কে লালন শাহ্‌ ঠিক কিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন তার প্রমাণ প্রাগুক্ত ক'টি কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। এই সব কবিতার মূল বক্তব্যের সংগে শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ মোটেই অসমঞ্জস নয়। ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ডঃ ভট্টাচার্যের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ তাঁর বক্তব্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে, অধ্যাপক সাহেবের এই উক্তিও তাই গ্রহণযোগ্য নয়। 'ইস্‌লাম' ও 'মুসলমান' শব্দদ্বয়ের তিনি যে ব্যাখ্যাদান করে লালনকে ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বী বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, সেই ব্যাখ্যাও অতি-ব্যাপ্তির দোষে দূষণীয়। কাজেই লালন শাহ্‌ মুসলিম-সন্তান ছিলেন কিনা সেটাই বিচার্য, তিনি ইস্‌লামকে অনুসরণ করতেন কিনা, তা নয়। এ-বিষয়ে অধ্যাপক সাহেবের আলোচনা বিশেষ তথ্যসমৃদ্ধ নয়। তিনি লালন শাহের যে বংশ-পরিচয় প্রদান করেছেন, তা নিরাসক্ত ভাবে বিচার করে দেখেননি। তাঁর উল্লেখ ও সিদ্ধান্তের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই—লোক-শ্রুতিকে অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু সে-সব বক্তব্য তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি। এজন্যে তাঁর অনেক উক্তিই নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায়না।

৪৮। শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২।

৪৯। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯-২০।

অবশ্য লালন শাহ্ মুসলমান ছিলেন, এই উক্তির সপক্ষে মুহম্মদ আবু তালিব সাহেব বলেছেন, "লালন শাহ্ শুধু মুস্লিম সন্তান-ই ছিলেন না তাঁরা বংশানুক্রমে মুসলমান ছিলেন।"[৫০] তিনি লালন-শিষ্য দুদ্দু শাহের পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করেই এ-উক্তি করেছেন। এবং একথা যথার্থ যে, দুদ্দু শাহের পাণ্ডুলিপিতে লালন শাহ্কে মুস্লিম-সন্তান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দুদ্দু শাহ্ লিখেছেন—

দরীবুল্লাহ্ দেওয়ান তাঁর আব্বাজীর নাম।
আমিনা খাতুন মাতা এবে প্রকাশিলাম ॥[৫১]

এই উল্লেখ ব্যতীত, লালন শাহ্ মুসলিম-সন্তান ছিলেন—তার অপর প্রমাণ, উক্ত পাণ্ডুলিপিতে বর্ণিত নবদ্বীপের একটি ঘটনা। ভ্রমণ-ব্যপদেশে লালন শাহ্ নবদ্বীপ পৌঁছে

একদিন যান এক পণ্ডিত সভায় ॥
পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁরে বিবিধ পুছিল।
সাইজি নাম ধাম সকলি বলিল ॥
সেবার সময় হইল পণ্ডিত সভার।
'যবন' বলিয়া দূরে সেবা দেয় তাঁর ॥[৫২]

লালন শাহ্ তাঁদের নিকট 'যবন' অর্থাৎ মুসলিম-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলে পরিচয় দেয়াতেই সাধুবাবাজীরা তাঁকে দূরে আহার্য দান করেন। অতএব এ ঘটনাও প্রমাণ করে যে লালন মুসলিম-সন্তান ছিলেন।

মৎ সংগৃহীত প্রাগুক্ত লালন-পরিচিতি অনুসারেও তিনি মুসলিম-সন্তান ছিলেন। পূর্ববংগীয় বাউল সমিতির প্রাক্তন সেক্রেটারী শাহ্ লতিফ আফীআনহু সাহেব জানিয়েছেন, "একটি দানপত্রে গ্রহীতা সাঁইজীর জাতি পরিচয়ে 'মুসলমান' বলে উল্লেখ আছে। উক্ত দানপত্র এখন শুকুর শা'র আস্তানার সংরক্ষক আহ্মদ আলী শা'র নিকট রক্ষিত আছে।" লালন শাহ্ সত্যই যে মুসলিম-সন্তান ছিলেন এবং নিজেকে তিনি সকল ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে 'বাউল মতবাদী' বলে প্রমাণ করতে চাইলেও ইস্লাম ধর্মের উত্তরাধিকার একেবারে অস্বীকার করতে

৫০। মুহম্মদ আবু তালিব, দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত প্রাগুক্ত প্রবন্ধ।
৫১। দুদ্দু শাহ্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১।
৫২। ঐ পৃঃ ২।

পারেননি তার প্রমাণ প্রাগুক্ত 'খত্‌নার জাত' উক্তির মধ্যে ও তাঁর স্বরচিত গানের ভণিতা-ব্যবহারের ধারার মধ্যে লুকায়িত। এজন্যে তাঁকে প্রচ্ছন্ন মুস্‌লিম বলা চলে। লালন শাহ্‌ স্বীয় জীবনের সকল ঘটনা লোক-সাধারণের অগোচর রেখে, বংশ-পরিচয় গোপন করে এবং কোনো বিশেষ ধর্ম-বর্ণ বা সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট আচার-আচরণ ত্যাগ করেও জন্মগত ইস্‌লামী ঐতিহ্য ও চিন্তাধারা থেকে সম্পূর্ণ রূপে বিশ্লিষ্ট হতে পারেননি। তাই লালন শাহের রচিত গানের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভণিতা-ব্যবহারের ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—তাঁর অচেতন-মন ইস্‌লামী কৃষ্টিকে বরাবরই ধারণ করে ছিল।

ভণিতা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করা আবশ্যক, হিন্দু ও মুস্‌লিম বাউল ফকীরদের ভণিতা-ব্যবহারের রীতি পৃথক পৃথক। হিন্দু-বাউল পদকর্তাদের ব্যবহৃত ভণিতার সঙ্গে মুসলিম-বাউল পদকর্তাদের ব্যবহৃত ভণিতার তুলনা-মূলক আলোচনা করলেই সে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন,

১। হিন্দু-বাউল পদকর্তাদের ভণিতা ব্যবহারের ধারা।

ক) পদকর্তার নিজের ব্যবহৃত :—

i) গুঁসাই যাদুবিন্দুর তেলো ডুঙ্গা
ডুবে গেল সাঁঝ-বেলায় ॥

ii) পাগল বিজয় বলে কর্মফলে
পেয়ে মানব দেহখান ॥

iii) খ্যাপা রসিক বলে বে-এলেমে
হবেনা ফকীরি ॥

খ) শিষ্যের ব্যবহৃত :—

i) প্রেম-অনুরাগ মহানন্দ কয়
এমন শান্তি হরির যুগল মিলন
কে কে দেখবি আয়।
গোঁসাই তারকচাঁদ কয়
এমন সময়
কেবল অশ্বিনীর অলস ভারি ॥

এই পদে শিষ্য অশ্বিনী স্বীয় গুরু তারক (পূর্ণ নাম তারকচন্দ্র কাঁড়াল)-এর উল্লেখ করতে গিয়ে গুরুর নামের পূর্বে সম্মান-সূচক 'গোঁসাই' (গোস্বামী) শব্দের উল্লেখ করেছেন।

২। মুস্‌লিম বাউল পদ-কর্তাদের ভণিতা ব্যবহারের ধারা।

ক) পদকর্তার নিজের ব্যবহৃত :—

i) কয় ফকীর মিয়াজান
আশ্চর্য এ-বিধান
মুনিব যে প্রজা
রাইয়তের হুজুরী॥

ii) মেছের শাহ্‌ কয় দিন বয়ে যায়
এখনো তোর সময় আছে।

iii) অধীন জহর ভনে ক্ষমা দে রাই মনে
কালো রূপ বিহনে তোর মানে পড়ুক ছাই॥

খ) শিষ্যের ব্যবহৃত :—

i) ময়েজদ্দি ভেবে বলে
আবদুল শা'র চরণ তলে।

ii) দরবেশ জব্বার তাই কয়
হালিম রে তুই পাবি কোথায়
নয় দরজা বন্ধ করে
মুখে লাগাও চাবি॥

এ দু'টি পদের প্রথমটিতে শিষ্য ময়েজ উদ্দীন তাঁর গুরু আবদুল-এর নামোল্লেখ করতে গিয়ে তৎপূর্বে সম্মান-সূচক 'শাহ্‌' শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং দ্বিতীয়টিতে শিষ্য-হালিম, গুরু জব্বারের নামোল্লেখ করতে গিয়ে তার পূর্বে সম্ভ্রমপূর্ণ 'দরবেশ' শব্দ যোজনা করেছেন। তাছাড়া লক্ষণীয় যে, হিন্দু-পদকর্তা গুরুর নাম ব্যতীত যে-পদের ভণিতায় শুধু নিজের নামোল্লেখ করেছেন সে-পদে নিজের নামের পূর্বে 'গোঁসাই', 'পাগল', 'খ্যাপা' ইত্যাদি বিশেষণ যুক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে এ-সব ক্ষেত্রে মুসলিম পদকর্তাগণ নিজের নামের পূর্বে 'ফকীর', 'শাহ্‌' 'অধীন,' প্রভৃতি শব্দ যোগ করেছেন।

হিন্দু ও মুস্‌লিম বাউল পদকর্তাদের এই ভণিতা-ব্যবহারের ধারাটি মৌলিক! এই পরিপ্রেক্ষিতে লালন শাহ্‌ ও তদীয় শিষ্য দুদ্দু শাহের ভণিতা-ব্যবহারের ধারাটিও লক্ষ্যযোগ্য।

ক) লালন শাহের নিজের ব্যবহৃত ভণিতা :—

i) কেউ তারে জেনেছে দড়
সে খোদার ছোট নবীর বড়
ফকীর লালন বলে নড়চড়
সে-বিনে কূল পাবা না ॥

ii) লালন শাহ্ ফকীরে বলে রে
দয়াল আগে হলাম না।

iii) অধীন লালন কয় নাই ভরসা
প্রেমানলে অংগ গো জলে ॥

খ) শিষ্য দুদ্দু শাহের ব্যবহৃত ভণিতা :—

i) লালন শাহ্ কয় আগম বচন
দুদ্দু সে ভেদ বুঝতে নারে ॥

ii) সারাৎসার জানি শাঁই কাদের গণি
দুদ্দু কয় লালন শাঁইর কৃপাতে ॥

iii) লালন শাঁই দরবেশের বচন
দুদ্দু সে প্রেম জানতে নারে ॥

অতএব ভণিতা-বিশ্লেষণ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, লালন শাহের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার মূলত ইস্‌লামী। যদি তিনি কায়স্থ বা অমুসলিম কোনো বংশে জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে ভণিতায় কখনো 'শাহ্', 'ফকীর' প্রভৃতি ইস্‌লামী ঐতিহ্য-সম্মত বিশেষণ প্রয়োগ করতেন না। তাঁর দীর্ঘকালের সংগী এবং প্রিয়তম শিষ্য দুদ্দু শাহ্‌ও কখনো তাঁকে 'দরবেশ' বলে অভিহিত করতেন না। তাছাড়া, জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা লালন শাহের মূল চিত্রেও দেখা যায় তিনি মুসলমানের ন্যায় গুম্ফ রাখতেন।

অতএব ভণিতা-বিশ্লেষণ, দুদ্দু শাহের বিবরণ, নবদ্বীপের ঘটনা, লালন-পরিচিতির বর্ণনা, দান-পত্রের উল্লেখ, জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অংকিত চিত্রের ইংগিত; সর্বোপরি লালন শাহের স্বরচিত কবিতায় বিধৃত উক্তি থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে—লালন শাহ্ মুসলিম-সন্তান ছিলেন।

তাঁর বংশ-পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম লিখেছেন—"লালনের পিতার নাম কারো মতে দবিরুল্লাহ্ শাহ্, কারো মতে মলম

শাহ্।"[৫৩] মুহম্মদ আবু তালিব সাহেব দুদ্দু শাহের পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করে লিখেছেন—'লালনের দাদার নাম ছিল দরীবুল্লাহ্ দেওয়ান।"[৫৪] তাঁর উদ্ধৃতি—

গোলাম কাদের তাঁর আব্বাজীর নাম।
আমেনা খাতুন মাতা এবে প্রকাশিলাম॥[৫৫]

বলা বাহুল্য, তৎপ্রদত্ত উদ্ধৃতি নির্ভুল নয়। কারণ লালন শাহের বংশ-পরিচয় দিতে গিয়ে উক্ত পাণ্ডুলিপিতে দুদ্দু শাহ্ উল্লেখ করেছেন—

গোলাম কাদের হন দাদাজি তাঁহার।
বংশ পরম্পরা বাস হরিষ পুর মাঝার॥
দরীবুল্লাহ্ দেওয়ান তাঁর আব্বাজীর নাম।
আমিনা খাতুন মাতা এবে প্রকাশিলাম॥[৫৬]

অতএব, গোলাম কাদির, লালন শাহের পিতা নন—পিতামহ। পিতার নাম দরীবুল্লাহ্ দেওয়ান। মাতা—আমিনা খাতুন। লক্ষণীয় যে, এ বিবরণে লালন শাহের বংশগত উপাধি স্পষ্ট নয়। 'দেওয়ান' শব্দটি উক্ত কবিতায় উপাধির দ্যোতক নয়। সম্ভবত লালন শাহের পিতা ছিলেন সাধক ফকীর। এ জন্যে 'দিওয়ানা' বা 'ঐশ্বরিক প্রেমে উন্মাদ' বলে হয়তো তাঁর একটা ব্যাপক পরিচিতি ছিল। লালন-বংশধরদের সংগে আলোচনা করে অধ্যাপক আফসার উদ্দীন সেখ লালন শাহের যে বংশ-তালিকা নির্ণয় করেছেন—তাতেও এ-ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লালন শাহের পিতার নাম দরীবুল্লাহ্ দেওয়ান মেনে নিয়েও অন্য নাম 'তারণ শাহ্' বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৭] অতএব একথা স্বীকার করা চলে যে, দুদ্দু শাহ্ হয়তো সেই লোক-প্রদত্ত বিশেষণ 'দেওয়ান' শব্দটিকেই ছন্দের খাতিরে দরীবুল্লাহ্ নামের সংগে যুক্ত করে দিয়েছেন।

এসন্দেহের অন্যতম কারণ প্রাগুক্ত লালন-পরিচিতিতে লালন শাহের বংশগত উপাধি রূপে 'কাজীর' উল্লেখ। সমস্ত বিবরণটা নিম্নরূপ :—

৫৩। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২।
৫৪। মুহম্মদ আবু তালিব, প্রাগুক্ত প্রবন্ধ।
৫৫। ঐ।
৫৬। দুদ্দু শাহ্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১।
৫৭। অধ্যাপক আফ্সার উদ্দীন সেখ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৯।

"শ্রী শ্রী লালন সা ফকীর
সাং হরিশ পুর
কলম
জেলা যশোহর
মলম
পিতার নাম মৃত্যু
দেয়নেত্ কাজী
লালন সার পরিবারের নাম
বিসখা
নানা
সশুরের গোলাম সা।[৫৭ক]

এ-বিবৃতি অনুসারে লালন শাহের পিতার নাম 'দেয়নেত্ কাজী'। এই দেয়নেত্ নিশ্চয় দরীবুল্লা'র ডাক নাম। তাহলে তাঁর পিতার নাম কাজী দরীবুল্লাহ্ দেওয়ান। পিতামহের নাম কাজী গোলাম কাদির ও মাতার নাম আমিনা খাতুন। এবং 'কাজী' তাঁদের বংশগত উপাধি।

অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম লালন শাহের অন্যান্য ভাইদের নামোল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন—'কুলবেড়ে হরিশপুর গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তি ও লালনের শিষ্যদের মতানুযায়ী আমরা জানতে পারি যে, লালন শাহের আরো দুই ভাই ছিলেন, তাঁদের একজনের নাম আলম শাহ্, আর একজনের নাম কলম শাহ্। লালনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আলম শাহ্ কলকাতায় শ্রমিকের কাছ করতেন।"[৫৮] উপর্যুদ্ধৃত বিবরণে এ সম্পর্কে কোনো বিস্তৃত তথ্য সন্নিবেশিত হয়নি। তবে বিবরণটির তৃতীয় ও পঞ্চম পংক্তিতে "কলম" ও "মলম" শব্দ দু'টি যেভাবে লেখা রয়েছে, তাতে বোঝা যায়, তাঁরা দুই সহোদর। লালন-বংশধর প্রাগুক্ত ক্ষেপুর মা'র সংগে আলোচনা করে অধ্যাপক আফসার উদ্দীন সেখ লালন শাহের যে বংশ-তালিকা নির্ণয় করেছেন তাতে তিনি লালনেরা চার ভাই বলে উল্লেখ করেছেন : আলম শাহ্, কলম শাহ্, চলম শাহ্ ও লালন শাহ্। এই তালিকায় মলম শাহের কোনো উল্লেখ নেই। তিনি চলম শাহ্ বিয়ে করেননি বলে

৫৭ ক। এটি মূলের অবিকল অনুলিপি। পত্রটি বর্তমানে বাঙ্লা একাডেমীতে রক্ষিত আছে।
৫৮। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২।

জানিয়েছেন। চলম শাহ্ সম্পর্কে তিনি আরো জানিয়েছেন—"হরিশপুর নিবাসী সাধক পাঞ্জ শাহের মধ্যম পুত্র জনাব রফি উদ্দিন লালনের পিতার নাম দরিবুল্লাহ্ দেওয়ান, লালনের ভাই চলমের অস্তিত্ব অস্বীকার এবং আলম শাহের বংশধর এখনও মুন্সিগঞ্জে জীবিত আছেন বলে আমার কাছে প্রকাশ করেন।"[৫৯] সম্ভবত চলম শাহ্ নামে লালনের কোনো ভাই ছিলনা। এবং আলম শাহের কথা প্রাগুক্ত বিবরণ দানকারীর জানা ছিল না। তাহলে তাঁরা মোট চারি ভাই ছিলেন—আলম শাহ্, কলম শাহ্, মলম শাহ্, লালন শাহ্। এঁদের ভেতর "ক্ষেপুর মা, কলম শাহকে প্রথম ও লালন শাহকে দ্বিতীয় পুত্র বলে মনে করেন এবং নিজেকে কলম শাহের বংশধর উল্লেখ করেন। হরিশপুরের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি জনাব মুন্সি আবদুল আজিজ ক্ষেপুর মাকে আলম শাহের বংশধর, চলম শাহ ও লালন শাহ বিয়ে করেননি এবং কলমের ছেলেপিলে হয়নি বলে আমাকে বলেন।" অধ্যাপক আফসার উদ্দীন সাহেবের এই বর্ণনা থেকে দেখা যায়—ক্ষেপুর মার ধারণায় লালন শাহ্ পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন। কিন্তু তা সত্য নয়। কারণ দুদ্দু শাহের বর্ণনা অনুসারে লালন শাহের অতি শৈশবে পিতৃ-মাতৃ বিয়োগ ঘটে। তাহলে তিনি পরিবারের সর্ব-কনিষ্ঠ সন্তান হিসেবেই বিবেচ্য।

ঘ. শৈশব ও কৈশোর॥

লালন শাহের বাল্য-জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। দুদ্দু শাহ্ লিখেছেন, তিনি অতি শৈশবে পিতৃ-মাতৃ হারা হয়ে অনাথ হন। উল্লেখ-যোগ্য যে, তাঁর জন্মের মাত্র দু'বছর আগে ঐতিহাসিক ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেখা দেয়। সম্ভবত এই মন্বন্তরে আলম ও মলম মৃত্যুমুখে পতিত হন। একমাত্র কলম জীবিত থাকেন। অতঃপর পিতামাতার মৃত্যু হলে লালন জীবিকার জন্যে বাধ্য হয়ে "হরিশপুরের দক্ষিণ পাড়ার ইনু কাজীর বাড়ীতে"[৬০] আশ্রয় নেন এবং গো-রাখালের কার্যে নিযুক্ত হন। একদিন বৈশাখ মাসের এক দুপুরে রাখাল বালক লালন, গরু চরিয়ে এসে যখন রাস্তার পাশে গাছের ছায়ায় বসে শ্রান্তি দূর করছিলেন, সে সময় পাল্কী কাঁধে নিয়ে ঐ পথ দিয়ে গৃহে ফিরছিলেন ঐ

৫৯। অধ্যাপক আফ্সার উদ্দীন সেখ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৯।

৬০। ঐ, পৃঃ ১২০।

গ্রামের-ই শিরাজ শাহ্। রৌদ্র-ক্লান্ত বালকের শুষ্ক-কচি মুখ শিরাজ শাহ্কে আকৃষ্ট ও ব্যথিত করে তোলে। তিনি পাল্কী নামিয়ে বালক লালনের সংগে আলাপ করে তার দুরবস্থার কথা জানতে পারেন। শিরাজ নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি লালনকে তখন পালিত-পুত্র রূপে গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। লালন তাতে সম্মত হলে শিরাজ শাহ্ পরদিন কাজী সাহেবের নিকট থেকে লালনকে পালক পুত্র রূপে গ্রহণ করেন। এই কাজী সাহেব লালনের রক্ত-সম্পর্কে আত্মীয় ছিলেন বলে মনে হয়। কারণ লালনের নিজের বংশগত উপাধিও কাজী।

কিন্তু শিরাজ-লালন সাক্ষাৎকার সম্পর্কে শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন —"সিরাজ নামে এক মুসলমান ফকির ও তাঁহার স্ত্রী লালনকে রোগ-যন্ত্রণায় অজ্ঞান অবস্থায় পথের উপর পরিয়া থাকিতে দেখেন। তাঁহারা দয়া পরবশ হইয়া লালনকে উঠাইয়া লইয়া সেবা শুশ্রূষার দ্বারা তাঁহাকে নিরাময় করেন। ···অতঃপর লালন···সিরাজের নিকট হইতে ফকিরি ধর্মে বা বাউল ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।"[৬১] বলা বাহুল্য, শিরাজ-লালন সাক্ষাৎকার প্রসংগে শ্রী ভট্টাচার্যের প্রদত্ত বিবরণ সঠিক নয়। কারণ তাঁর মতে লালনের জন্মভূমি ভাঁড়ারা এবং শিরাজ শাহের বাসস্থান—"কুষ্টিয়া অঞ্চলে নয়। ফরিদপুর জেলার কালুখালি স্টেশনের নিকটে কোনো গ্রামে এক সময় তাঁহার বাড়ী ছিল।"[৬২] কুমারখালি নিবাসী শ্রী ভোলানাথ মজুমদারের নিকট থেকে তিনি এ তথ্য সংগ্রহ করেন বলে জানিয়েছেন। অন্যপক্ষে, লালন ও শিরাজ শাহের বাসস্থান যশোর জেলার ঝিনেদা মহাকুমায় হরিশপুর গ্রামে বলে যে 'কথা শোনা' যায় সে বিষয়ে তিনি বলেছেন—"বিংশ শতাব্দীর প্রথম পদ পর্যন্ত এই মতাবলম্বী (বাউল) বহু মুসলমান ফকিরের আস্তানাই এই গ্রামে বর্তমান দেখিয়াছি। সুতরাং···লালন গুরু সিরাজ সাঁই-এর বাস এখানে কল্পনা করা অস্বাভাবিক নয়।"[৬৩] এ থেকে ধারণা করা যায়—শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে শিরাজ শাহের বাসস্থান ফরিদপুর।

অন্যদিকে শ্রী বসন্তকুমার পাল শিরাজ শাহের বাসস্থান যশোর জেলার ফুলবাড়ী গ্রামে বলে উল্লেখ করেছেন।[৬৪] আর মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন সাহেবের

৬১। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।
৬২। ঐ, পৃঃ ৯।
৬৩। ঐ, পৃঃ ৯-১০।
৬৪। বসন্তকুমার পাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০০।

বর্ণনায় তাঁর বাসস্থান ছিল নদীয়া জেলার হরিনারায়ণপুর গ্রামে।[৬৫] শিরাজ-লালন সাক্ষাৎকার প্রসংগে বসন্ত বাবু বলেছেন—লালন শাহ্ হিন্দু ছিলেন। শৈশবে গঙ্গাস্নান শেষে স্বগৃহে ফেরার পথে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। তখন মৃতকল্প লালনকে সৎকার শেষে গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু "লীলাময়ের ইচ্ছায় পতিতোদ্ধারিণীর স্নিগ্ধ লহরে অন্ত্যেষ্টিকৃত লালনের অন্তঃসংজ্ঞাশীল দেহ তীরে উঠিয়া পড়ে, এই সময় তাঁহার কণ্ঠ হইতে অস্ফুট স্বর উত্থিত হয়।" তখন তন্তুবায় জাতীয়া এক রমণী তাঁকে দেখতে পান এবং পুরুষদের সহায়তায় তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তাঁত-ঘরে রেখে শুশ্রুষা করতে থাকেন। এভাবে "লালন যখন তাঁহার জীবনদাত্রী জননীর বস্ত্র-বয়নগৃহে শায়িত, ঘটনাচক্রে সেই সময় এই দরবেশ (শিরাজ শাহ্)-ও পর্যটন করিতে করিতে এই গ্রামে আসিয়া লালনের বৃত্তান্ত শুনিতে পান এবং অচিরে তাঁহার রোগ-শয্যার পার্শ্বে আসিয়া সমাসীন হন।"[৬৬] মোটামুটি এই বক্তব্যই "মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন,[৬৭] আনিসুজ্জামান[৬৮] প্রভৃতি গ্রন্থকার স্বীকার করে নিয়েছেন। এ সম্পর্কে অধ্যাপক আফসার উদ্দীন সাহেব কিছু নতুন কথা বলেছেন। তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায়—"লালন হরিশপুরের দক্ষিণ পাড়ার ইনু কাজীর বাড়ীতে থাকতেন ও তাঁদের গরু চরাতেন। একদিন তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন। কি একটি কারণে সেই বাড়ীর লোকজনের উপর রাগ করে লালন সাবের আলী খাঁ নামক অন্য এক ব্যক্তির বাড়ীতে আশ্রয় নেন। সেই রাতেই লালনের গায়ে বসন্ত ফুটে বার হয়। তারপর সাবের আলীর বাড়ীর লোকজন বসন্তের ভয়ে লালনকে বাটিকামারা বিলের থানার ঘাটে রেখে আসেন। এখান দিয়ে শিরাজ শাহ্ নামক জনৈক পাল্কী বেহারার স্ত্রী দৈনিক থানার ঘাটে পানি আনতে যেতেন। যন্ত্রণাকাতর লালনকে দেখে বাড়ী ফিরে সিরাজ-পত্নী স্বামীকে সংবাদ দেন। তারপর লালনকে সিরাজের বাড়ীতে আনা হয় এবং সেখানেই সিরাজ-পত্নীর যত্নে লালন ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেন। এই সময়ে লালনের বয়স ১৭/১৮ বছর ছিল।"[৬৯]

৬৫। মুহম্মদ মনসুর উদ্‌দীন, বা. সা. মু. সা., পৃঃ ১৯।
৬৬। বসন্তকুমার পাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০০।
৬৭। মুহম্মদ মনসুর উদ্‌দীন, মুহম্মদ কানালউদ্দীন সংকলিত লালন গীতিকা-১ম খণ্ড (ঢাকা-১৯৬২), ভূমিকা পৃষ্ঠা ৯।
৬৮। আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০২।
৬৯। অধ্যাপক আফসার উদ্দিন সেখ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২০।

অধ্যাপক আফ্‌সার উদ্দীন সাহেব এ-তথ্য কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন তার কোনো উল্লেখ করেননি। কাজেই মনে হয়, জনশ্রুতির উপর নির্ভর করেই তিনি এ কাহিনী পরিবেশন করেছেন।

কিন্তু দুদ্দু শাহের স্বহস্ত লিখিত বিবরণের সংগে এ দু'টি কাহিনীর একটিরও মিল নেই। প্রথমত, লালন শাহের ন্যায় শিরাজ শাহ্‌ও যে হরিশপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন—একথা তিনি সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন—

কুলবাড়ী হরিষপুরে সিরাজ সা-'র বাস।
পাল্কী টানিয়া করে জীবিকা অম্বাষ॥[৭০]

"...পরবর্তীকালে লিখিত মৌলবী আবদুল ওয়ালী সাহেবের প্রবন্ধেও এই তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন—"...**Both (Lalan Shah & Siraj Shah) were born at the village Horispur, sub-division Jhenedah, District Jessore.**"[৭১] অতএব শিরাজ শাহ্‌ ও লালন শাহের জন্মস্থান যে একই গ্রামে একথা সত্য। দুদ্দু শাহ্‌ লালনের বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়া সম্পর্কে সঠিক তথ্য নির্দেশ করতে পারেননি। তবে লালন শাহ্‌ যে বাল্যকালে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হননি একথা স্পষ্ট রূপেই ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, ৪৩ বছর বয়সে লালন শাহ্‌ খেঁতুরীর মেলায় গমন করার পর, প্রত্যাবর্তনকালে রোগাক্রান্ত হন। এবং বাল্যকালে তিনি সাধক শিরাজ শাহের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। দীর্ঘ ২৬ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি এঁরই গৃহে অবস্থান করেন। এই বর্ণনা সম্পর্কে সন্দেহ করার কিছু নেই। কারণ এসব ঘটনা তিনি লালন শাহের নিজের মুখ থেকে গোপনে শুনেছেন বলে দাবি করেছেন।

যাহোক, দুদ্দু শাহ্‌ লিখেছেন—

শিশু কালে সাইজিরে তাঁরা (পিতামাতা) ছাড়ি গেল,
অনাথ হইল চাঁদ বিধাতার খেলা॥
এমনি নিদান কালে বৈশাখ মাসেতে,

৭০। দুদ্দু শাহ্‌, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২।
৭১। Maulavi Abdul Wali. Ibid. p. 217.

আনমনে একাকী সে রহে বসে পথে ।
সাইজির লীলাখেলা কে বুঝিতে পারে
সিরাজ সা দরবেশে দেখে নিল তারে ঘরে ॥[১২]

অতঃপর উপযুক্ত বয়সে তিনি তাঁকে মক্তবে বিদ্যাশিক্ষার জন্য ভর্তি করে দেন।

দুদ্দু শাহ্ অবশ্য এ সম্পর্কে কিছু বলেননি। অধিকাংশ ফকীরের ধারণা লালন নিরক্ষর ছিলেন। এ বিষয়ে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন—"'হিতকরী' পত্রিকাতেও ঐরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। লালনের গানগুলির মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের যে জ্ঞান, মতবাদের উপর যে অবিচলিত নিষ্ঠা, যে সত্যদৃষ্টি ও কবিত্বশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা দেখিলে লালনকে নিরক্ষর ভাবিতে মন কুণ্ঠিত হয়। ···তিনি যে নিরক্ষর ছিলেন, এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে কোনো গ্রহণযাগ্য প্রমাণ নাই।"[১৩] কিন্তু তিনি যে শিক্ষিত ছিলেন তাঁর স্বপক্ষেও উপেন্দ্রনাথ বাবু কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম বলেছেন—"লালন ফকির শিক্ষিত ছিলেন না। তবে আরবী ভাষায় তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। কোরান শরীফের উপর তাঁর বেশ দখল ছিল। ···বাংলায় তাঁর সামান্য জ্ঞান ছিল বলে ভাষার উপর তত দখল আসেনি।"[১৪] লালন-গীতির ভাষা-ব্যবহার তথা শব্দ-সম্পদ ও ধ্বনি-মাধুর্য এবং প্রয়োগ-নৈপুণ্য সম্পর্কে করিম সাহেবের মন্তব্য সঠিক নয়। লালন-গীতির বিকৃত-পাঠ সম্পর্কে উপর্যুক্ত মন্তব্য সত্য হতে পারে, কিন্তু তার প্রকৃত পাঠ-বিচারে একথা কিছুতেই বলা চলেনা, ভাষার উপর তাঁর দখল ছিল না। আর তাই এ মন্তব্যও এই কারণে সত্য হতে পারেনা—যে, লালন নিরক্ষর ছিলেন।

লালন শাহ্ নিজে পুথিগত বিদ্যা অপেক্ষা প্রকৃতি থেকে শিক্ষা গ্রহণই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন। তাই তিনি বলেছেন—

"এল্‌মে লা-ছুন্নি" হয় যার
সর্ব ভেদে মালুম হয় তার
লালন বলে ছটাকে মোল্লার
ছট্‌ফটি মিছে ।

১২। দুদ্দু শাহ্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১-২।
১৩। শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮
১৪। আনোয়ারুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮।

আবার দুদ্দু শাহের বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি যখন মলম শাহের কোরান পাঠে-ভুল নির্দেশ করেছিলেন, তখন—

শুনিয়া মলম ভাই পুলকিত ভারি।
মিষ্ট বচনে তবে তাহারে শুধায়
কি করে জানিলে তুমি পাঠে ভ্রান্তি হয়।
এত শুনি সাই তারে বুঝাইয়া দিল
'নাহি জানি লেখা পড়া'-ইহাই বলিল।
দয়াল মুরশীদ মোরে "লা-দুন্নি"র জ্ঞান,
কিঞ্চিৎ দিয়াছে তায় করিনু বয়ান।...[৭৫]

এখানেও লালন শাহ্ আত্মপ্রকাশ করেননি। দুদ্দু শাহের বর্ণনাও লালন শাহের অক্ষর জ্ঞানের উপর কোনো প্রত্যক্ষ আলোকপাত করেনা। তবে উদ্ধৃতি থেকে এ কথা বোঝা যায়—তিনি তখন (এ সময় লালনের বয়স চল্লিশের ঊর্ধ্বে) উত্তম রূপে আরবী ভাষা জানতেন। 'সহি' করে কোরান শরীফ পাঠ করতে পারতেন। ভাষাজ্ঞান তাঁর প্রখর না থাকলে নিশ্চয় ভুলপাঠের কারণ-নির্দেশ করতে পারতেন না।

এ ছাড়া দুদ্দু শাহের রচনার আরম্ভে আছে —

ধন্য ধন্য মহামানুষ দয়াল লালন সাই
পতিত জনার বন্ধু তাঁর গুণ গাই
জাতি ধর্ম্ম শাস্ত্র আদি মিমাংসা করিয়া
নবসত্য প্রকাশিল মানব লাগিয়া।[৭৬]

লক্ষণীয় যে, এখানে শাস্ত্রাদি আলোচনা বা "মীমাংসা"-(বিশ্লেষণ?)র কথা আছে। অশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে নিশ্চয় শাস্ত্র-বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। বিভিন্ন ভাষা ভালভাবে পড়তে, লিখতে ও বুঝতে না পারলে শুধুমাত্র অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও নানা শাস্ত্রের তুলনামূলক বিচার সম্ভব হতে পারেনা। কাজেই লালন শাহ্ যে শিক্ষিত ছিলেন—তার একটা প্রচ্ছন্ন স্বীকৃতি উপর্যুক্ত পংক্তিতে বিদ্যমান—এ ধারণা অযৌক্তিক নয়।

৭৫। দুদ্দু শাহ্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪
৭৬। ঐ, পৃঃ ১

লালন শাহের কবিতাতেও একটি শিক্ষিত ও কর্ষিত কবিমনের পরিচয় পরিস্ফুট। তাঁর কবিতায় বাঙ্‌লা, আরবী, ফারসী শব্দ এবং বাক্যাংশের নিখুঁত বিন্যাস ও সুস্থ যোজনা এই প্রতীতিকেই প্রমাণ করে।

তুলনামূলক বিচারে দেখা যায়—লালন শাহ্‌ ও পাগলা কানাই সমসাময়িক এবং প্রায় একই রকম প্রতিভার অধিকারী। কিন্তু পাগলা কানাইয়ের কবিতার শব্দ-চয়ন ও লালন শাহের কবিতার শব্দ-চয়নে পার্থক্য অনেক। পাগলা কানাই-এর কবিতায় প্রচুর অসংস্কৃত, আঞ্চলিক, গেঁয়ো, দেশজ শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন—"আলো" (এলো অর্থে), "পাতাম" (পেতাম অর্থে), "খাঁড়ায়" (দাঁড়িয়ে অর্থে), "টানেটুনে" (টানাটানি করা অর্থে), "চাম" (চর্ম অর্থে), "ছাওয়াল" (সন্তান অর্থে), "ছ্যাম্‌ড়া" (ছোঁড়া বা ছোট ছেলে অর্থে) ইত্যাদি। কিন্তু শব্দচয়নের এই কুশরূপ, লালন শাহের কবিতায় বিরল। বরং এমন এমন শব্দ, বাক্যাংশ, উপমা ও রূপকের সন্ধান মেলে—যা তাঁর সুগভীর ভাষাজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তিনি তাঁর কবিতায় অবলীলাক্রমে সন্ধি, সমাস, নামধাতু ইত্যাদির ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কোথাও তা অপপ্রয়োগে পরিণত হয়নি। যেমন,—

ক) সন্ধি :— এক একেশ্বর সৃষ্টি করে। হৃদাকাশে উদয় হবে। মনাতীত অধরে চিন্‌তে। বাগীন্দ্রিয় না সম্ভবে। যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র আদি/যোগ সাধিয়েও পায়না নিধি। গোপী ভাবাশ্রিত ইত্যাদি।

খ) সমাস :—মানুষ-গুরু নিষ্ঠা যার। ভাষা-বাক্যে নাহি পারে। গুরু-নিষ্ঠ যারা। বসে থাকো ভাব-ত্রিবেণী।

গ) নামধাতু :—মনের ভাব প্রকাশিতে। সব শিখে চমৎকারা। যাতে উদর শুধরে পতি। ইত্যাদি।

তাছাড়া, শুধুমাত্র বিভিন্ন ধর্ম-শাস্ত্র-সম্পর্কেই তিনি গভীর ভাবে অবহিত ছিলেন না। সেই সংগে ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, ভূগোল, খগোল, আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি, পৃথিবীর গোলত্ব ইত্যাদি সম্পর্কেও তাঁর যথার্থ ধারণার প্রকাশ লালন শাহের কবিতায় ছড়িয়ে আছে। যেমন···

সুধাইলে খুদার কথা
দেখায় সবাই আসমানে।
আছেন কোথায় স্বর্গপুরে
কেউ নাহি তার ভেদ জানে ॥

পৃথিবী গোলাকার শুনি
অহর্নিশি ঘোরে আপনি
তাইতে হয় দিবস-রজনী
জ্ঞানীগণে তাহাই মানে ॥

ঊর্ধ্ব দিকে নিশি হলে
অধঃ দিক্ষে দিবা বলে
আকাশ তো দেখে সকলে
ঊর্ধ্ব অধেঃর মানুষ গনে ॥...

২

তাছাড়া, আরবী ভাষায় বলে আল্লা
ফারসীতে হয় খোদাতা'লা
গড্ বলিছে যিশুর চ্যালা
ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভাবে ॥...

৩

অথবা, আগমে-নিগমে তাই কয়
গুরু রূপে দীন দয়াময়
অসময়ে সখা তার হয়
সত্য করে যে তায় ভজিবে ॥...

৪

কিংবা, আদিকালে আদমগণ
নানান জায়গায় করত ভ্রমণ
ভিন্ন আচার, ভিন্ন বিচার
তাইতে সৃষ্টি হয় ॥

জ্ঞানী দিগ্বিজয়ী হোল
নানারূপ সব দেখতে পেল
দেখে নানারূপ সব হোল বেকুব
এরূপে জাতির পরিচয় ॥

খগোল, ভূগোল নাহি জানত
যার যার কথা সেই বলিত
লালন বলে কলি কালে
জাত বাঁচানো দায় ॥

এসব কবিতায় নিশ্চিতরূপেই লালন শাহের একটি বিদগ্ধ মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

এ রকম পরোক্ষ্য প্রমাণ ব্যতীত লালন শাহ্ যে যথার্থ শিক্ষিত ছিলেন, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণও বিদ্যমান। শাহ্ লতীফ আফী-আন্-হু বলেছেন—'সম্প্রতি "লালন শাহ্" নাম স্বাক্ষরিত একখানি দলিল পাওয়া গেছে। বাউল কবি মনিরুদ্দীন শাহ (লালন-শিষ্য) বলেছেন—তিনি লালন শাহের নিকট তুলট কাগজে লেখা কিছু খাতাপত্র দেখেছিলেন। সেগুলো তাঁর নিজের হাতের লেখা। মৃত্যুর কিছু পূর্বে একদিন লালন শাহ্ উক্ত খাতাসমূহ কালী গংগায় ফেলে দেন। তৎপর তিনি (মনিরুদ্দীন শাহ্) অনেক খুঁজে সে-খাতাগুলোর মধ্যে মাত্র একখানি খাতা অর্ধ-বিগলিত অবস্থায় পেয়ে নিয়ে আসেন। কিছুদিন পর তাঁর নিজেরও ভাবান্তরে তিনি উক্ত খাতাটি আবার নদীতে নিক্ষেপ করে আসেন।'

ছেঁউড়িয়াতে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করার পর লালন দীর্ঘদিন আয়ুর্বেদী মতে চিকিৎসা করতেন। তখনো তাঁর খ্যাতি সুবিস্তৃত হয়নি। এ সময় থেকে বহু বছর তিনি এই চিকিৎসা চালিয়ে গিয়েছেন। ফলে তাঁর নিকট অনেক নিদানের কবিরাজী চিকিৎসাগ্রন্থ ছিল। চিকিৎসা-বিদ্যা বিষয়ে তাঁর নিজের লেখা কিছু খাতাপত্রও ছিল। এগুলো তিনি প্রয়োজনমত অধ্যয়ন করতেন।

এসব কারণে অনুমান করা যায়—বাল্যবয়সে শিরাজ শাহের আশ্রয়ে থাকা কালে তিনি স্বগ্রাম বা নিকটবর্তী কোনো গ্রামের মক্তব থেকে ভাল ভাবে আরবী

ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। বাঙ্‌লা ভাষার সংগেও তিনি এই মক্তব থেকেই পরিচিত হন। তখন মক্তবে বাঙ্‌লা ভাষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হোত না বলে—বাল্যকালে তিনি বাঙলা ভাষা যথেষ্ট সুন্দর রূপে শিখতে পারেননি। এই অভাবটি পূর্ণ হয় তাঁর নবদ্বীপ বাসকালে। তিনি দীর্ঘ সাত বছর অবস্থান করেন এবং এখানেই বাঙলা ভাষা উত্তম রূপে আয়ত্ত করেন। পুথিগত, ব্যাকরণ-শাসিত বিদ্যা হয়তো তাঁর প্রচুর ছিলনা। কিন্তু লালন শাহের কবিতায় তেমন স্বল্প ভাষাজ্ঞানেরও কোনো পরিচয় নেই। নবদ্বীপের নানা শ্রেণীর পণ্ডিতদের সাহচর্য তাঁর ভাষা-শিক্ষা ও জ্ঞান-চর্চার সহায়ক হয়েছিল। এ জ্ঞান তিনি অর্জন করেছেন—প্রবাস-জীবনে, সাধক-পথে, গণ-সংযোগে। একেই তিনি "লা-দুন্নির জ্ঞান" বলেছেন। লালন শাহ তাই হয়তো যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু যথোপযুক্ত শিক্ষিত ছিলেন। আর এ শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল শৈশবেই।

শিরাজ শাহের অবস্থা খুব স্বচ্ছল ছিল না। তিনি লালনের উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেননি। হয়তো তখন তা' সম্ভবও ছিল না। শিরাজ শাহ দরিদ্র পাল্কী-বাহক ছিলেন। পাল্কী বহন করে উপার্জিত আয় দ্বারা তিনি সংসার যাত্রা নির্বাহ করতেন। ফলে, লালনের উচ্চ-শিক্ষা দানের খরচ সংগ্রহ করার সামর্থ তাঁর ছিল না। তা'ছাড়া, উচ্চশিক্ষা লাভের উপযোগী শিক্ষায়তনও নিকটবর্তী কোথাও ছিল না। বিদেশে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করাও তাই লালনের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

মাদ্রাসা-শিক্ষা সমাপ্ত হলেই শিরাজ শাহ কিশোর লালনকে ফকীরি-তত্ত্বে দীক্ষা দান করেন। লালনও গুরুর নিকটতম সংস্পর্শে থেকে ক্রমে ক্রমে উক্ত তত্ত্বের পাকা বোদ্ধা রূপে গড়ে উঠেন।

মৃত্যুর পূর্বে শিরাজ শাহ তাঁর গুরু আমানত উল্যা শাহের খিলকা-ঝোলা লালনকে অর্পণ করেন এবং সাধন-তত্ত্ব সম্পর্কে অছিয়ৎ করে যান। তাঁদের-স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যুর পর "ফাতেহা" (মৃতের কল্যাণার্থে শেষ করণীয়) শেষ করে লালনকে দেশ-ভ্রমণেরও নির্দেশ দান করেন। অতঃপর লালনের ২৬ বছর বয়সে ১২০৫ সালে (ইং ১৭৯৮ খ্রী) শিরাজ-দম্পতি একই দিনে পরলোক গমন করেন। লালন শাহ্‌ গুরু ও গুরু-পত্নীর মৃত্যুর পর কয়েকদিন হরিশপুরে অবস্থান

করে তাঁদের ফাতেহা শেষ করেন। তারপর গুরু-প্রদত্ত 'খিলকা-ঝোলা' এবং 'আশা' গ্রহণ করে নবদ্বীপ অভিমুখে রওনা হন।

ঙ. দেশ-ভ্রমণ ।।

লালন শাহ্ নবদ্বীপ পৌঁছলে—

"পদ্মাবতী নামে এক বিধবা রমণী
নিজাবাসে লয়ে গেল সেহি ক্ষত্র-ধনি ।।"[৭৭]

এই "ক্ষত্র-রমণী" পদ্মাবতীকেই পরবর্তীকালে লালন শাহ 'মা' বলতেন। ফলে জনশ্রুতিতে পদ্মাবতীই লালন শাহের গর্ভধারিণী রূপে পরিচিতা। আর লোক-বিশ্বাসকেই তথ্য-নির্বাচনে অগ্রাধিকার দেবার জন্যে—লালন-জীবনী রচনা করতে গিয়ে পদ্মাবতীকে লালন শাহের গর্ভধারিণী রূপে স্থির বিশ্বাস করে বসন্তকুমার পাল, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন প্রভৃতি পণ্ডিত ভুল করেছেন।

নবদ্বীপে এই পদ্মাবতীর গৃহে লালন শাহ দীর্ঘ সাত বছর অতিবাহিত করেন। এখানে আগমনের পর একদিন তিনি এক সাধু-সম্মেলনে যোগদান করেন। সাধু-পণ্ডিতগণ নবাগত লালন শাহের পরিচয় গ্রহণ করে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। লালন শাহ সে-সব প্রশ্নের যথাযোগ্য জবাব দান করে সবাইকে চমৎকৃত করেন। যুবক লালনের প্রজ্ঞা, শাস্ত্রজ্ঞান ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁরা মুগ্ধ হন।

অতঃপর সাধুবাবাজীদের 'সেবার' (আহারের) সময় উপস্থিত হয়। সাধুরা তখন, লালন শাহ নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়ায়, তাঁকে দূরে পৃথক ভাবে অন্ন পরিবেশন করেন। কিন্তু আহার্য গ্রহণ করতে বসে তাঁরা গভীরতম বিস্ময়ের সংগে লক্ষ্য করেন যে, তাঁদের সংগে, প্রতি দু'জনের মধ্যে একজন করে লালন বসে আহার্য ভক্ষণ করছেন। এ ব্যাপার দেখে—

"তখনি সকলে মিলি গৌরধ্বনি করে।
করজোড়ে নত শিরে দু'টি পদ ধরে।
মিনতি করিয়া কাঁদে, দয়াল গোঁসাই।

৭৭। দুদ্দু শাহ্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২।

মোদের ছলিতে এলে মোরা বুঝি নাই ॥
ক্ষমা কর দীনবন্ধু পাতকী জনারে।
গড়াগড়ি যায় আর এমত ফুকারে ॥''[৭৮]

তখন লালন তাঁদের—

''বিভিন্নতা করিও না জাতি-ধর্ম্ম ব'লে'[৭৯]

এই উপদেশ দান করে প্রস্থান করেন। ঘটনা হিসেবে বর্ণনীয় বিষয়ের আধুনিক মূল্য অকিঞ্চিৎকর। কারণ ঘটনাটি অলৌকিক। অতএব, অবিশ্বাস্য কিংবা রূপক। কিন্তু সম্প্রদায়িকতার পটক্ষেপে লালন জীবনীর একটি তিক্ত অভিজ্ঞতাই ঘটনাটির মূল উপজীব্য। এই ঘটনার পর তিনি ধর্ম্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের ভেদাভেদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে অভিযান শুরু করেন। মানুষে-মানুষে সমদর্শিতা তাঁর সংকীর্ণতা-দুষ্ট ছিলনা। ফলে তিনি নিজেকেও জীবনে আর কখনো কোনো ধর্ম-বর্ণ-গোত্রভুক্ত বলে প্রকাশ্যে পরিচয় দান করেননি। পূর্বে উদ্ধৃত জাতি-পরিচয় সম্পর্কে রচিত তাঁর গানে যে, তিক্ত, বিতৃষ্ণ, ব্যঙ্গপ্রবণ ও ক্রুদ্ধ মনের পরিচয় পাওয়া যায়, তার মূল, নবদ্বীপের এই ঘটনায় প্রোথিত।

লালন শাহ নবদ্বীপে বিভিন্ন শাক্ত, বৈষ্ণব, যোগী এবং তান্ত্রিক সাধু-সন্ন্যাসীদের ঘনিষ্ট সংস্পর্শ লাভ করেন। এখানে অবস্থানকালেই তিনি ভারতীয় ধ্যান-ধারণার সুপ্রাচীন লৌকিক মতবাদ 'তন্ত্র' সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তন্ত্রের সাধন-প্রণালী, পঞ্চ-রসিক এবং ষড়-গোস্বামী যাজিত বৈষ্ণব সহজিয়া সাধন-প্রণালী, শাক্ত-সাধনা, নাথ-সাধনা ও যোগ-সাধন-পন্থা সম্পর্কেও যথাযথ ভাবে অবহিত হন। বেদান্ত ও বৈশেষিক দর্শন, বৌদ্ধ নিরীশ্বরবাদ, কপিলের সাংখ্য মতবাদ প্রভৃতি বিষয়ে ও তিনি এইখানে বসে জ্ঞান লাভ করেন। পরবর্তীকালে প্রচারিত তাঁর নব্য বাউলমতবাদের উপর এসবের গভীরতর প্রভাব তাই লক্ষণীয়। তিনি কপিলের পুরুষ-প্রকৃতি-তত্ত্বকে সুফীবাদী চিন্তাধারার আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন।

নবদ্বীপে সাত বছর অতিবাহিত করে ১২১২ সালে (ইং১৮০৫) লালন ব্যাপক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে স্থান ত্যাগ করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি কাশী, বৃন্দাবন

৭৮। দুদ্দু শাহ্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২।
৭৯। ঐ, পৃঃ ৩।

পুরী প্রভৃতি হিন্দুদের বিখ্যাত ভারতীয় তীর্থ সমূহ পরিভ্রমণ করে মধ্য এশিয়ায় যাত্রা করেন। শোনা যায়, পায়ে হেঁটে তিনি মক্কা নগরীতেও গমন করেন। ভারতের দিল্লী, লক্ষ্ণৌ এবং মধ্য এশিয়ায় অবস্থান কালে লালন ইস্‌লামের অধ্যাত্ম-বাদ—তাসাউফ, বিশেষ করে সুফী মতবাদ ও সাধন-প্রণালী এবং মুতাযিলা দর্শন সম্পর্কে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাই তাঁর মতবাদ ও সাধনায় এসবের গভীর প্রভাব সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

বিভিন্ন স্থানে এভাবে সুদীর্ঘ দশ বছর ভ্রমণ করার পর অবশেষে ১২২২ সালে (ইং ১৮১৫ খৃঃ) তিনি নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন। এবং ঐ বছর মাঘ মাসে তিনি খেঁতুরীর মেলায় যোগদান করতে পদব্রজে রওনা হন। লালন শাহ তখনও তাঁর নিজস্ব মতবাদ প্রচারকর্মে আত্মনিয়োগ করেননি। ফলে কেউ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেনি। এমতাবস্থায় একাকীই তিনি খেঁতুরী যাত্রা করেন।

চ. ছেঁউড়িয়ায় আগমন ॥

খেঁতুরী-ভ্রমণ লালন-জীবনীর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ এই ভ্রমণের সংগেই তাঁর বসন্তরোগ, মলম শাহের সাথে সাক্ষাৎ ও কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়াতে আখ্‌ড়া নির্মাণের ঘটনা জড়িত।

লালনের বসন্তরোগে আক্রান্ত হওয়া সম্পর্কে শ্রী বসন্তকুমার পাল বলেছেন, "সাঁইজী···দাস-বংশের বাউলদাস নামক কোনো প্রতিবাসীর সহিত সহরে গঙ্গাস্নানে যাত্রা করেন। ·· গঙ্গাস্নান সমাপন করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কালে বসন্তরোগে গুরুতর রূপে আক্রান্ত হন। ···দুরন্ত ব্যাধির প্রকোপে তিনি মৃতবৎ অসাড় হইয়া পড়েন। সঙ্গীগণ তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া যথাবিহিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া মুখাগ্নি দ্বারা গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।"[৮০] বর্ণনাটি যে কাল্পনিক অথবা জনশ্রুতি নির্ভর তা সহজেই ধারণা করা যায়। কারণ পূর্বালোচনায় দেখা গিয়েছে লালন শাহ নিশ্চিত রূপেই মুসলিম সন্তান। অতএব, বসন্ত রোগে মৃত্যু হলেও মুখাগ্নি করার কোনো প্রশ্নই উঠেনা। সর্বোপরি, বসন্তবাবু এই ঘটনাকে লালন শাহের বাল্য-জীবনের ঘটনা বলে

৮০। শ্রী বসন্তকুমার পাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯৮।

নির্দেশ করেছেন। আর তাঁর মতে লালন শাহের জন্মভূমি কুষ্টিয়া। প্রকৃত পক্ষে লালনের শৈশব ও কৈশোর যশোর জেলার হরিশপুর গ্রামে অতিবাহিত হওয়ায় তাঁর পক্ষে কুষ্টিয়ার কোনো দাসবংশের কোনো ব্যক্তির সংগে গঙ্গা স্নানে গমন করা সম্ভব নয়।

শ্রীবসন্তকুমার পালের উপর্যুক্ত বক্তব্যের সংগে মুহম্মদ মন্‌সুরউদ্‌দীনের বর্ণনার বিশেষ পার্থক্য নেই। তিনি শুধু বাউলদাসের পরিবর্তে "মাতৃসঙ্গে" গঙ্গাস্নানে যাত্রা করার কথা উল্লেখ করেছেন।"[৮১] তথ্যপ্রাপ্তির উৎস নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন "কথিত আছে"। কিন্তু কথিত তথ্যটি যে ভুল তা পূর্ব-আলোচনাতেই স্পষ্ট বোঝা যায়। জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও বলেছেন—"প্রথম যৌবনে তিনি (লালন) হিন্দুদের অন্যতম বিখ্যাত তীর্থ শ্রীক্ষেত্রে যান···কিন্তু পথের মধ্যে তিনি বসন্ত-রোগে আক্রান্ত হন।"[৮২] কিন্তু দুদ্দু শাহের পাণ্ডুলিপিতে বলা হয়েছে—১২২২ সালে লালন শাহ খেঁতুরীর মেলায় যোগদান করেন। অতঃপর মেলা থেকে প্রত্যাবর্তন কালে—

> ·····নৌকাযোগে ভ্রমণ কারণ
> দক্ষিণ-পূর্ব দেশে করিলেন গমন।।
> কি জানি কেমনে তিনি বসন্ত ব্যাধিতে
> আক্রান্ত হইলে তাঁরে, ফেলায় নদীতে।
> ভক্তবৃন্দ নাহি ছিল সঙ্গেতে তাহার।
> মাঝিগণ ফেলে তাঁরে দরিয়া মাঝার।।[৮৩]

অর্থাৎ কখন এবং কিভাবে লালন শাহ বসন্ত-কবলিত হন, তা দুদ্দু শাহও যথার্থ বলতে পারেন না। তবে খেঁতুরী থেকে ফিরে আসার সময়-ই তিনি রোগাক্রান্ত হন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ধারণা করা যায়, বসন্তের পূর্ব-লক্ষণ সমূহ খেঁতুরী অবস্থানকালেই প্রকাশ পায়। লালন শাহের পক্ষে তখন পদব্রজে গমন করা অসম্ভব মনে হওয়ায় তিনি ভাড়াটিয়া নৌকায় গড়াই-এর

৮১। মুহম্মদ মনসুরউদ্‌দীন, বা. সা. মু. সা., পৃ ১৮।
৮২। শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ ৮।
৮৩। দুদ্দু শাহ্‌, প্রাগুক্ত, পৃ ৩।

শাখা কালীগঙ্গা নদী দিয়ে কুষ্টিয়া অভিমুখে রওনা হন। পথিমধ্যে রোগের বিশেষ বাড়াবাড়ি ঘটে। তখন ভীত মাঝি-মাল্লারা তাঁকে অজ্ঞান-অবস্থায় রাত্রিকালে এক নদীর ঘাটে ফেলে রেখে চলে যায়।

দুদ্দু শাহ্ যদিও তাঁকে 'নদীর মধ্যে'ই ফেলে দেবার কথা লিখেছেন, তথাপি তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। নদীতে নিক্ষেপ-করলে মৃত-প্রায় মানবদেহ ভেসে এসে একটা ঘাটে লাগতে পারেনা। অথচ তিনি তা-ই বলেছেন। লালন শাহকে মাঝিরা লোকালয়ের নিকটে কোনো ঘাটে ফেলে রেখে যায়---এ-কথাই যুক্তিসংগত।

যাহোক, কালীগঙ্গাতীরস্থ এই স্থানটি ছেঁউড়িয়া। এই ছেঁউড়িয়া গ্রামেরই মলম বিশ্বাস কারিকর নামক এক ব্যক্তির ঘাটে তিনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকেন। সকাল বেলায় মলম বিশ্বাস স্নান করতে এসে মুমূর্ষু লালনকে নদীর কূলে পড়ে থাকতে দেখেন। সম্ভবত তখন তাঁর দেহের কিছু অংশ পানির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। এ ব্যাপারটিই হয়তো তাঁর "অন্তর্জলি"র কথায় কিংবা 'ভেসে এসে ঘাটে লাগা'র কথায় জনশ্রুতিতে বেঁচে আছে।

তখনো লালনের দেহে জীবনের লক্ষণ অবশিষ্ট ছিল। ফলে, করুণাপরবশ হয়ে মলম বিশ্বাস তাঁকে সযত্নে তুলে আপন গৃহে নিয়ে যান। এবং

দুগ্ধ আদি নানা পথ্য দিয়া সেবা করে ॥
এইরূপে একমাস গুজারিয়া যায়।
ব্যাধি মুক্ত হন তিনি খোদার কৃপায় ॥[৮৪]

কিন্তু লালন শাহের ছেঁউড়িয়ায় আগমন ও মলম বিশ্বাসের সংগে তাঁর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম লিখেছেন—"কুষ্টিয়ায় ছেঁউড়িয়াতে সিরাজ সাঁই-এর কোনো আখড়া ছিল না। অবশ্য এই অঞ্চলের মলম শাহ্ কারিগর নামে এক ব্যক্তি সিরাজ সাঁই-এর শিষ্য ছিলেন। লালনের প্রতি তাঁর অদ্ভুত টান এসে যায়। তিনি সিরাজ সাঁইকে এই মর্মে অনুরোধ করেন যে, ছেঁউড়িয়াতে আখড়া করে লালনকে সেখানকার দায়িত্বভার দান করা হোক। সিরাজ সাঁই মলম শাহ্ কারিগরের অন্তরের ইচ্ছা বুঝ্তে সক্ষম হন। এবং

৮৪। দুদ্দু শাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ ৩।

লালন শাহ্‌কে ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় প্রেরণ করেন। সেই অবধি লালন শাহ্ ছেঁউড়িয়াতে বসবাস করতে থাকেন।"[৮৫] এ তথ্যের তিনি উৎস নির্দেশ করেননি।

বলা বাহুল্য, তথ্যটি নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ প্রথমতঃ মলম শাহ্ সিরাজ শাহের শিষ্য ছিলেন না; তিনি ছিলেন লালন শাহের প্রথম শিষ্য। দ্বিতীয়ত সিরাজ শাহ্ লালনকে ছেঁউড়িয়াতে পাঠাননি। লালন নিজেই ভাগ্যক্রমে ছেঁউড়িয়াতে উপস্থিত হন। তৃতীয়ত, লালন শাহ্ ছেঁউড়িয়াতে হাজির হয়েছিলেন ১২২২ সালে এবং সিরাজ শাহ্ তার সতেরো বছর পূর্বে ১২০৫ সালে ইন্‌তিকাল করেন। কুষ্টিয়ায় তাঁর কোনো আখড়া ছিল এমন কোনো প্রমাণও নেই। এ সব কারণে, অধ্যাপক আনোয়ারুল সাহেবের উক্তি বিশ্বাস্য নয়।

অন্যপক্ষে, লালন ও মলম শাহের পরস্পর সাক্ষাৎ এবং লালন শাহ্ কর্তৃক ছেঁউড়িয়ায় আখড়া-নির্মাণ প্রসংগে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সাহেব বলেছেন, গৃহ-প্রত্যাখ্যাত (?) লালন 'সন্ন্যাসীর বেশে নানাস্থান ঘুরিতে ঘুরিতে···বর্ত্তমান মোহিনী মিলের সন্নিকটস্থ কালীগঙ্গার তীরবর্তী ছেঁউড়িয়া গ্রামের একটি বটবৃক্ষ তলে অবস্থান করেন। এই গ্রামের মলম শাহ্ একজন গরীব মুসলমান ছিলেন। ···তিনিই তাঁহাকে ভক্তিভরে সঙ্গে করিয়া আপন গৃহে লইয়া আসেন এবং স্বামী-স্ত্রী দুইজন মিলিয়া তাঁহার খেদমত করিতে থাকেন।"[৮৬] প্রকৃতপক্ষে লালন শাহ্ গৃহ-প্রত্যাখ্যাত ছিলেন না। এবং মলম বিশ্বাস তাঁকে "বটবৃক্ষ তলে" কুড়িয়ে পাননি। এ বিষয়ে প্রদত্ত দুদ্দু শাহের বর্ণনার সঙ্গে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের প্রদত্ত বিবরণের মূলগত প্রভেদ থাকায় এবং মনসুরউদ্দীন সাহেবের তথ্য-প্রাপ্তির কোনো নির্ভরযোগ্য উৎস নির্দেশের অভাবে মলম বিশ্বাস তাঁকে নদীর ঘাট থেকে তুলে নিয়ে এসে আরোগ্য করেন, এ কথাই যথার্থ বলে মনে হয়।

লালনের নিকট মলম বিশ্বাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ সম্পর্কে দুদ্দু শাহ্ একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি হোল, একদিন ভোর বেলায় মলম বিশ্বাস কোরান তেলাওয়াৎ করছিলেন। সদ্য-রোগমুক্ত লালন শাহ্ পাশে বসে মনোযোগ

৮৫। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫।

৮৬। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, মুহম্মদ কামাল উদ্দীন সংকলিত প্রাগুক্ত গ্রন্থ, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ।০

সহকারে তা' শুনছিলেন। মলম বিশ্বাস কোরান শরীফের সুরা আর-রহ্‌মানের "বাইনা হুমা বারজাখুল্লা ইয়ার জিয়ান" আবৃত্তি কালে—

সাঁই (লালন) ভুল ধরি তারে করেন ফরমান।।
কি পড় কোরয়ান মিঞা এত ভুল করি।
শুনিয়া মলম ভাই পুলকিত ভারি।।
মিষ্ট বচনে তবে তাহারে শুধায়
কি করে জানিলে তুমি পাঠে ভ্রান্তি হয়।।
এত শুনি সাঁই তারে বুঝাইরা দিল।
'নাহি জানি লেখাপড়া'—ইহাই বলিল।।[৮৭]

ক্রমে ক্রমে লালনের পাণ্ডিত্য, বিভিন্ন ধর্ম-শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ও অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে মলম বিশ্বাস তাঁর নিকট সস্ত্রীক বাইয়াৎ গ্রহণ করেন। তিনি ধনী গৃহস্থ ছিলেন। শিষ্যত্ব গ্রহণের পর তাই পৈতৃক সত্ত্বে প্রাপ্ত নিজ অংশের ৫১ বিঘা জমি লালন শাহ্‌কে সাধু সেবায় দান করেন এবং বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে এক তেঁতুল গাছতলায় তাঁর আখ্‌ড়া তৈরী করিয়ে দেন। তখন থেকে লালন শাহ্‌ দেশ ভ্রমণ ত্যাগ করে ছেঁউড়িয়াতেই স্থায়ীরূপে সাধক-জীবন শুরু করেন।

ক্রমে তাঁর সাধনার খ্যাতি সারা কুষ্টিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে। এমন কি কুষ্টিয়ার বাইরেও বিভিন্ন স্থান থেকে বহু লোক এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে থাকে। হিন্দু যোগী, বৈরাগী এবং বে-শরা ফকীরদের গণ্ডী অতিক্রম করে লালন শাহের প্রভাব সাধারণ জন-সমাজেও বিস্তৃত হয়। ফলে, শরীয়তবাদী মুসলিম জনসাধারণের একাংশ অবশেষে তাঁর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রচারে অবতীর্ণ হন। এবং তাঁকে নাসারা, কাফের, নেড়ার ফকীর, ভেদো ফকীর ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করেন।

এ বিষয়ে শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের প্রতি দোষারূপ করে অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম লিখেছেন—"অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ মহাশয়···অভিযোগ করেছেন শরীয়তবাদী মুসলমানগণ লালনকে ভালো চোখে কোনোদিনই দেখেননি এবং এই বাউলপন্থী নেড়ার ধার্মিকেরা চিরকাল ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা লাঞ্ছিত

৮৭। দুদ্দু শাহ্‌, প্রাগুক্ত, পৃ ৩-৪।

ও অপমানিত হইয়াছেন। কথাগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা; এবং দুরভিসন্ধিমূলক।"[৮৮] কিন্তু শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের প্রতি অধ্যাপক সাহেবের এই দোষারোপ এবং কটূক্তি ভিত্তিহীন। কারণ লালন শাহ্ যে প্রকৃতই শরীয়তবাদী ছিলেন না, একথা সত্য। আর এ ব্যাপারে যে তাঁকে বহুবার মোল্লা-মৌলবী সাহেবদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছে দুদ্দু শাহের পাণ্ডুলিপিতে তার একাধিক ঘটনার উল্লেখ আছে। তৎকালে বাউল মতের সঙ্গে মুসলিম সমাজের আলেম শ্রেণীর ধর্মচেতনার সংঘর্ষ বেধেছিল তারও ঐতিহাসিক প্রমাণ ইদানীং আবিষ্কৃত হয়েছে। মুহম্মদ আবু তালিব সাহেবের আবিষ্কৃত মুদ্রিত পুস্তক "বাউল ধ্বংস ফতোয়া" এ বিষয়ের চূড়ান্ত উদাহরণ। কাজেই বাউলমত প্রচার করতে গিয়ে লালন শাহ্কে যথেষ্ট বিব্রত হতে হয় এবং বহুবার বাহাছে অবতীর্ণ হতে হয়।

দুদ্দু শাহ্ লিখেছেন—

নানা দেশ হতে শেষে আসে নানা জন।
তর্ক করিতে কেহ করে আগমন॥
চক্কর, ফক্কর, আর মানিক, মলম।
কোরবান, মনিরদ্দিন আসে কতজন॥[৮৯]

উপর্যুক্ত মলম ও লালন শাহের উদ্ধার কর্তা মলম বিশ্বাস পৃথক ব্যক্তি। চক্কর ওর্ফে চাঁদ আলী ও ফক্কর ওর্ফে ফরাতুল্লাহ্ কুষ্টিয়া জেলার চড়াইকোলের অধিবাসী ছিলেন। মানিক শাহের বাসস্থান ছিল ছেঁউড়িয়াতে। এ অঞ্চলে তিনি পণ্ডিত বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আর কোরবান আলী ছিলেন পাবনার অধিবাসী।

এঁরা কেউ লালনকে উচ্ছেদ করতে, কেউ তাঁর মতবাদের অসারতা প্রমাণ করতে লালন শাহের সঙ্গে তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। অবশেষে পরাজিত হয়ে বাউল ধর্ম গ্রহণ করে সারাজীবন লালনের পদসেবায় রত থাকেন। মনিরুদ্দিন শাহের বাড়ী ছিল যশোর জেলার হরিণাকুণ্ডু থানায়। তিনি ঘোড়ায় চড়ে চাবুক নিয়ে লালন শাহকে বেশরা মত প্রচার করা থেকে বিরত রাখার জন্য শায়েস্তা করতে এসেছিলেন। কিন্তু লালনকে চাব্কাতে এসে অবশেষে সে

৮৮। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯।
৮৯। দুদ্দু শাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ ৪।

চাবুক হজরত ওমরের মত তাঁরই পদতলে রেখে বাউল মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ করে ধন্য হন।

লালনের শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম শিষ্য দুদ্দু ওর্ফে দবিরুদ্দীন শাহ্‌ও এমনি ভাবে তাঁর সঙ্গে বাহাছ করতে এসে বাইয়াৎ গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে তিনি নিজেই লিখেছেন,

বাহাছ করিতে গিয়া বায়াৎ হইনু
আমি অতি অভাজন লালন সাঁই বিনু ॥[৯০]

শাহ্ লতীফ্ আফী আন-হু বলেছেন—"মৌলবী দবীর উদ্দীন এক মহিষের গাড়ী বোঝাই হাদিস্, দলিল, ফতোয়ার কেতাব ইত্যাদিসহ বড়দরে'র হাজী হাসানকে সঙ্গে নিয়ে বাহাছ করতে আসেন। উদ্দেশ্য, লালন শাহের প্রচারিত বাউল মতবাদের অসারত্ব প্রমাণ করা এবং তাঁকে শরীয়তের পথে ফিরিয়ে আনা। শর্তস্থির হয়—যতক্ষণ বাহাছ চলবে, কেউ আহার, বাহ্য-প্রস্রাব বা স্নানের জন্য উঠতে পারবেন না। এইভাবে প্রথম সাতদিন হাজী হাসান ও পরবর্তী সাতদিন মৌলবী দবীরুদ্দীন সাহেব বাহাছ করে পরাজিত হন। পঞ্চদশ দিনে তাঁরা লালন শাহের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। লালন শাহ্ তাঁদের আরো বাহাছ চালাতে সময় দিতে সম্মত ছিলেন, কিন্তু মৌলবী সাহেব তাঁর নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করে সব দ্বন্দ্বের নিরসন করেন।"

এভাবে লালন শাহের বাউল মতবাদ প্রচারের জন্যে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে বাহাছ-সংগ্রাম চালাতে হয়। এসব বাহাছের ভিত্তিতে নাগর শাহ নামক একজন লালন-শিষ্য কয়েকখানি বাউল মতবাদের সিদ্ধান্ত পুস্তক প্রণয়ন করেন। উক্ত পুস্তকগুলোর মধ্যে একখানির নাম "ফকীরি জাহের বা আক্কেল নামা বা দরবেশ নামা"। পাণ্ডুলিপিটির ১৬ পৃষ্ঠায় বিধৃত বিবৃতি অনুসারে জানা যায়—হিজলা বটগ্রামের মুন্‌শী তোফাজ্জেল হোসেন নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে লালন শাহ্ কুষ্টিয়া শহরে বাহাছে প্রবৃত্ত হন। উক্ত তর্ক-যুদ্ধের

কয়েক ছওয়াল মুন্সী আগেতে পুছিল।
আল্লাহ্‌র মেহেরে ফকীর জওয়াব তার দিল ॥

৯০। দুদ্দু শাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ ৪।

লালন শাহ্, কুষ্টিয়াতে স্থায়ীভাবে আখ্‌ড়া নির্মাণের পর আয়ুর্বেদী পন্থায় চিকিৎসা করতেন। এ সময় তাঁর নিকট বহু কবিরাজী গ্রন্থ এবং স্বহস্ত-লিখিত খাতাপত্র ছিল—একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। চিকিৎসা থেকে যা আয় হোত তাই দিয়ে তিনি নিজের গ্রাসাচ্ছাদান করতেন। মলম বিশ্বাসের ওয়াক্‌ফ-কৃত সম্পত্তির সমস্ত আয় তিনি বাউল মতবাদ প্রচারকার্যে ও সাধু-সেবায় অর্থাৎ বাৎসরিক শিষ্য-সম্মেলনে ব্যয় করতেন।

শেষ-জীবনে তিনি মাত্র একবার আহার করতেন। তাঁর স্বহস্তে তৈরী একটি পানের বরজ ছিল। উক্ত বরজ থেকে তিনি প্রত্যহ একশ'টি ক'রে পান গ্রহণ করতেন। বৃদ্ধ বয়সে শারীরিক ক্লেশের জন্যে তিনি ঘোড়ায় চড়ে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করতেন। তাঁর মাথায় লম্বা চুল ও একটি চক্ষু অন্ধ ছিল। বসন্ত-রোগে তাঁর এচক্ষু নষ্ট হয়েছিল—একথা সত্য নাও হতে পারে। কারণ তাঁর একটি গানে বলা হয়েছে,

মনের হোল মতি-মন্দ।
জন্মে, তাইতি হলাম 'জন্ম-অন্ধ'॥

লালন শাহ্ বাঙ্‌লা ১২৯৫ সালের পহেলা কার্তিক শুক্রবারে (ইং ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর) দেহত্যাগ করেন। 'হিতকরী'তে বলা হয়েছে—"মৃত্যুর প্রায় একমাস পূর্ব হইতে ইঁহার পেটের ব্যারাম হয় ও হাত পায়ের গ্রন্থি জলস্ফীত হয়। দুগ্ধ ভিন্ন পীড়িত অবস্থায় অন্য কিছু খাইতেন না। ··মরণের পূর্ব রাত্রিতেও প্রায় সমস্ত সময় গান করিয়া রাত্রি ৫টার সময় শিষ্যগণকে বলেন, 'আমি চলিলাম।' ইহার কিয়ৎকাল পরে শ্বাসরোধ হয়। মৃত্যুকালে কোন সম্প্রদায়ী মতানুসারে তাঁহার অন্তিমকার্য সম্পন্ন হওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ও উপদেশ ছিল না। তজ্জন্য মোল্লা বা পুরোহিত কিছুই লাগে নাই। ···তাঁহারই উপদেশ অনুসারে আখ্‌ড়ার মধ্যে একটি ঘরের ভিতর তাঁহার সমাধি হইয়াছে।"[৯১] তাঁর শেষ-জীবনের সাধন-সঙ্গিনী মতিবিবির কবরও এই ঘরের মধ্যেই।

লালন শাহ্ দীর্ঘ জীবনে একাধিক সাধন-সঙ্গিনী গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের একজনের নাম বিশাখা ও অপরের নাম মতিবিবি। বিশাখা ছিলেন

৯১। উদ্ধৃত, শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ ১২৬।

গোলাম শাহের নাত্‌নী। এর পিতার নাম জানা যায়না। ইনি ছিলেন লালনের সাধক-জীবনের প্রথম সাধন-সঙ্গিনী। মতিবিবিকে তিনি শেষ জীবনে কোথা হতে সংগ্রহ করেন—তা' অজ্ঞাত।

অধ্যাপক আফ্‌সার উদ্দীন যদিও লালনকে বিবাহিত বলে উল্লেখ করেছেন,[৯২] তথাপি তা সত্য নয়। লালন শাহ্‌ আদৌ শাস্ত্রীয় অর্থে বিবাহ করেননি। এ বিষয়ে প্রাগুক্ত লালন-পরিচিতিতে বিশাখাকে বিবাহিতা পত্নীরূপে যে উল্লেখ আছে—তাও যথার্থ নয়। হরিশপুরের সবচেয় বৃদ্ধ ব্যক্তি জনাব আবদুল আজিজ সাহেবও লালনকে চিরকুমার বলে উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম বাঙ্‌লার প্রায় সমস্ত প্রবন্ধকারই এ বিষয়ে একমত যে, লালন শাহ্‌ কমপক্ষে দু'টি পত্নীর পাণি-গ্রহণ করেন। এদের একজনকে তিনি "অল্পবয়সে" বিবাহ করেন এবং অন্যজনকে কুষ্টিয়ায় স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করার পর। লালনের বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন—"তখনকার বাল্য-বিবাহের যুগে অল্প বয়সেই লালনের বিবাহ হয়।"[৯৩] ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তও এ বক্তব্য সমর্থন করেছেন।[৯৪] লালনের দ্বিতীয় বিবাহ সম্পর্কে শ্রীভট্টাচার্যের অভিমত—"গুরুর সহিত নানাস্থানে ভ্রমণের পর সম্ভবতঃ গুরুর মৃত্যু হইলে তিনি আনুমানিক ১২৩০ সালে কুষ্টিয়ার প্রান্তে গোরাই নদীর ধারে সেঁউড়িয়া নামক পল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হন।" এবং···"ঐ স্থানের এক মুসলমান জোলা রমণীকে লালন নিকা করিয়া তাঁহারই বাড়ীতে বাস করেন।"[৯৫] এ বক্তব্যের সঙ্গে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনও একমত।[৯৬] মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সাহেব এ সম্পর্কে আরও বলেছেন,"ছেঁউড়িয়ার দুইটি প্রাচীন লোকের সহিত সম্প্রতি আলাপ করিয়া জানিতে পারি যে·····লালন শাহের স্ত্রী পর্দানশীন ছিলেন।"[৯৭]

৯২। অধ্যাপক আফসারউদ্দীন সেখ, প্রাগুক্ত, পৃ ১২২।

৯৩। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ ৮।

৯৪। শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ।৵০

৯৫। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ ১০।

৯৬। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, বা, সা, মু, সা, পৃ ১৯।

৯৭। মুহম্মদ কামাল উদ্দীন সংকলিত প্রাগুক্ত গ্রন্থ, ভূমিকা, পৃঃ ।৶০

কিন্তু পূর্বালোচনায় জানা গিয়েছে, লালন শাহ্ শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে যশোর জেলার হরিশপুরের অধিবাসী শিরাজ শাহের আশ্রয়ে লালিত-পালিত হন। কাজেই লালনের বাল্য-বিবাহ হলে, তা' একমাত্র শিরাজ শাহের ইচ্ছাতেই সম্পূর্ণ হতে পারত। কিন্তু শিরাজ শাহের তেমন কোনো ইচ্ছা ছিলনা। এবং লালন ২৬ বছর বয়স পর্যন্ত যে বিবাহ করেননি, তা পরবর্তী আলোচনায় প্রমাণিত হবে। লালন ছেঁউড়িয়ায় উপস্থিত হন ১২২২ সালে। তখনো তিনি ছিলেন অকৃতদার। এ ধারণা সত্য হবার কারণ এই যে, বাউল সাধনা পরকীয়া রস-রতির সাধনা। এসব সাধকদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ১৩১২ সালে শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য লিখেছেন—"এই মতের (গুরু সত্য মত বা বাউল মত) প্রধানগণ প্রায় সকলেই অকৃতদার সঙ্গীতপ্রিয় সাধক।"[৯৮] তাছাড়া দুদ্দু শাহের পাণ্ডুলিপিতেও এ বিষয়ের কোনো উল্লেখ নেই। লালন শাহ্ সত্যি বিবাহ করলে, নিশ্চয় দুদ্দু শাহ্ তার উল্লেখ করতেন।

লালন-জীবনী অনুসরণ করলে দেখা যায় শৈশবে গৃহহীন লালন পালক পিতা ও গুরু, বাউল শিরাজ শাহের স্নেহচ্ছায়ায় প্রতিপালিত হন। এই গুরুর সাহচর্যে তাঁর জীবনের সুদীর্ঘ ২৬ বছর অতিবাহিত হয়। এ সময়ের মধ্যেই তিনি বাউল তত্ত্বে পুরোপুরি ভাবে দীক্ষিত হন এবং বাউল সাধনার উপযুক্ত করে নিজেকে গড়ে তোলেন। বাউল মতে মৃত্যু দু'রকম। প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত। প্রাকৃত মৃত্যুতে দেহের বিনাশ ঘটে। অপ্রাকৃত মৃত্যুতে দেহের বিনাশ ঘটে না ; কিন্তু মুক্তিলাভের পথ চিরতরে বন্ধ হয়। এই মৃত্যু হোল স্ত্রী-সম্ভোগের দ্বারা সন্তানের জন্মদান। বাউলমতে সন্তানের জন্ম হলে, উক্ত সন্তানের মাধ্যমেই পিতা জীবিত থাকে। কারণ সন্তান পিতারই নবতর আবির্ভাব। কাজেই কর্ম-চক্র থেকে, এমন অবস্থায়, সাধকের মুক্তির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তাই বাউলদের পক্ষে বিবাহ করা শুধু অধর্ম নয়, নিষিদ্ধও।

তাছাড়া গুরুর মৃত্যুকাল পর্যন্ত লালন শাহ্ খিল্‌কা-ঝোলার অধিকারী হননি। কাজেই খিলাফত না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর পরকীয়া রস-সাধনায় নারী-সঙ্গের কোনো প্রশ্নই ওঠেনা। তথাপি তিনি যদি বিবাহিত হতেন, তাহলে

৯৮। শ্রী মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য, "নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা" সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (১ম সংখ্যা, ১৩১২), পৃঃ ৪৩।

শিরাজ শাহ্ তাঁকে বিদেশ-ভ্রমণের উপদেশ দান করতেন না। আর লালনও সুদীর্ঘ সত্তের বছর ব্যাপী দেশ-ভ্রমণ উপলক্ষে বিদেশ-বাস করতে পারতেন না। অতএব তেঁতাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি যে বিবাহ করেননি একথা অবশ্যই সত্য।

তৃতীয়ত, বাউলের নারী-সঙ্গ ও গৃহীর পত্নী-গ্রহণ এক ব্যাপার নয়। বাউলেরা গৃহী নন। নারী দেহকে তাঁরা কখনো ভোগ করেন না। অন্তত তেমন কোনো বিধি নেই। আর এজন্যেই প্রকৃত বাউল, সাধন-সঙ্গিনী (সাধারণের চোখে স্ত্রী)কে 'মা' বলে সম্বোধন করেন। ছেঁউড়িয়ায় এসে লালন শাহ্ সর্বপ্রথম বিশাখাকেই সাধন-সঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করেন। অবশ্য এই সঙ্গিনী-নির্বাচনেও কিছুটা বিবাহের অনুরূপ মামুলী অনুষ্ঠান করার আবশ্যক হোত—Indian Penal code-এর ভয়ে। সেকথা মৌলভী আবদুল ওয়ালী সাহেব স্পষ্টরূপেই উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন—"Music in which they (the Faqirs) excel, and which they much practice, is one of their chief instruments of winning the hearts. Women —generally widowed, out-casted, and fallen of any pursuasion —are their next instrument." এ উক্তিরই পাদ-টীকায় তিনি লিখেছেন—"There is no marriage, but if the woman be the member of a family which do not allow her to be abducted, a kind of formal marriage ceremony is gone into, for fear of the Indian Penal Code."[৯৯] অতএব লালন শাহের সাধন-সঙ্গিনী গ্রহণ যে গৃহীর পত্নীগ্রহণ নয়,তা অবশ্য স্বীকার্য।

লালন শাহ্ তাঁর সুদীর্ঘ জীবনকালে একাধিক সাধন-সঙ্গিনী গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের একজনের নাম বিশাখা; অপরের নাম মতিবিবি। এঁরা কেউ-ই তাঁর বিবাহিত পত্নী নন। অতএব লালন বিবাহিত ছিলেন, এ ধারণা একান্তই ভুল। তাঁর স্ত্রী পর্দানশীন ছিলেন, এ উক্তিও হাস্যকর। তিনি ছিলেন চিরকুমার। কারণ চির-কৌমার্য বাউল-সাধনার "লালন শাঁই মত"-এ মুক্তি ও সিদ্ধি লাভের অন্যতম অপরিহার্য শর্ত।

৯৯। Moulavi Abdul Wali, ibid, p. 248.

॥ ৩ ॥

ক. ধর্ম-জীবন ॥

লালন শাহের ধর্ম-জীবন ছিল নিষ্কলুষ ও মহান। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে মানব-প্রীতিই ছিল তাঁর সে-জীবনের মূল ভিত্তি। নবদ্বীপের সাধু সমাবেশে গোত্র-পরিচয় দান করে তিনি যে লাঞ্ছনা ভোগ করেছিলেন, তা তাঁর সারা-জীবনের পাথেয় হয়ে ছিল। তিনি নিজেও এই লাঞ্ছনার জবাবে বলেছিলেন,

বিভিন্নতা করিও না জাতিধর্ম বলে ॥
আলেখ অধর সেই দয়াময় সাই।
সৃষ্টি স্থিতি জুড়ে তার জাতি গোত্র নাই।
জাতি ধর্ম কুল গোত্র মানুষের সৃজন
ভিন্ন বলে কিছু আমি দেখিনা কখন ॥
সকল জনার মাঝে একই সেই ঈশ্বর
নানা স্থানে নানারূপে করেন বিহার ॥[১০০]

লালন শাহ্ নিজে একটি বিশেষ ধর্ম-মতের অধিবক্তা হয়েও অপর কোনো ধর্মমতকে কখনো কোনো আঘাত করতেন না। তিনি বুদ্ধের মত, যিশুখ্রীষ্টের মত, হযরত মোহাম্মদ (দঃ)এর মত, শ্রীচৈতন্যের মত যে-কোনো স্তরের, যে-কোনো বর্ণের এবং শ্রেণীর মানুষকেই স্বীয় মতবাদে দীক্ষিত করতেন। যে-কোনো ব্যক্তির গৃহে অন্নগ্রহণ করতে তাঁর কখনো সংকোচ দেখা দেয়নি। স্বীয় মতবাদে অটল থেকেও তিনি পরমত-সহিষ্ণু ছিলেন এবং অপর ধর্মকেও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন। হৃদয়ের এই অকুণ্ঠ উদারতার জন্যই লালন শাহ্ বলতে পেরেছেন,

ধর্মের উদ্দেশ্য যদি হয় আল্লা'র নির্ণয়।
তাহা হলে সকল ধর্মেস্থ তারে পাওয়া যায় ॥

তালেবুল মাওলা যে হয়
সকল ধর্মেই সে তারে পায়
আল্লা কারো একান্ত নয়
চেয়ে দেখরে এই দুনিয়ায় ॥

১০০। দুদ্দু শাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ ৩।

এ জন্যই তিনি কোনো ধর্ম এবং কোনো মানুষকে কখনও অবহেলা করতেন না। হিন্দু-মুসলমান সকলকেই তিনি আপন অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাঁর অবাধ মেলা-মেশা ছিল। এ জন্যে জাতি-বিচারকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখতেন। তাই জাত-বিচার সম্পর্কে তাঁর উক্তি,

জাত-বিচারী ব্যভিচারী
জাতির গৌরব বাড়ী বাড়ী
দেখিলাম চেয়ে।
লালন বলে হাতে পেলে
জাতি পোড়াতাম আগুন দিয়ে॥

শুধু তাই নয়—সাম্প্রদায়িক দাংগা-হাংগামাও তিনি গভীরতর বেদনার সংগে অবলোকন করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

যবন-কাফের ঘরে ঘরে
শুনে আমার নয়ন ঝরে
লালন বলে মারিস কারে
চিন্‌লিনে মনের ধোঁকায়॥

ধর্ম-জীবনে লালন শাহ্ উদার, সত্যবাদী, নিরহংকার ও অত্যন্ত সুরুচি-সম্পন্ন ছিলেন। নিয়মিত সংগীতের দ্বারা সাধন-ভজন করতেন। বিশেষত, রাতের শেষ প্রহরে প্রত্যহ তিনি স্ব-নির্দিষ্ট 'জিকির' করতেন। এই জিকিরের সময়ও গান চলত। এভাবে তাঁর সাধনায় গানের প্রাধান্য থাকায় শরীয়ৎবাদী মুসলমানগণ তাঁকে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা করতেন এবং সময় সময় কটূক্তিও করতেন। এরকম কটূক্তির জবাবে লালন বলেছেন,

সাধা সোহাগিনী ফকীর
সাধে কি হয়।
তবে কে কেহ কেহ বেদাং সেদাং কয়॥

যার নাম সাধি সেইতো গান
কোরাণেতে পড়ে এলহান
নইলে কি আর হাদিস্ কোরাণ
পড়তে অত রাগ-রাগিনী স্থায়॥

সব গান যদি বেদাৎ হতো
তবে কি গান ফেরেস্তায় গাইত ?
চেয়ে দেখো মে'রাজ-পথ
নবীজিকে নাচতে গাইতে নেয় ॥

আধ-খুট্টী পৌণ-বাঙ্গালী ভাই
গানের ভাবনা জেনে গোল বাধাই
গানের ভাব-বিশেষে ফল দিবেন শাঁই
লালন ফকীর কয় ॥

এমনিভাবে গোঁড়া মুসলমানদের হাতে তাঁকে যথেষ্ট নিগ্রহ সইতে হয়েছে। তবু তিনি নিজের পথ থেকে কখনো বিচ্যুত হননি।

লালন শাহ্ স্বীয় জীবনধারণের জন্য ভিক্ষা করতেন না। মলম শাহ্ কর্তৃক ওয়াক্‌ফ-কৃত সম্পত্তির ফসল থেকে তাঁর নিজের ব্যয় ও বাৎসরিক সাধুসমাগম-উৎসবের খরচ নির্বাহ হোত। প্রতিবছর ছেঁউড়িয়া-আখড়ায় সমাগত শিষ্যবৃন্দের নিকট তিনি উদার মানব-প্রেম ও ধর্ম-বাণী প্রচার করতেন।

শেষ জীবনে লালন শাহ্ প্রতিদিন মাত্র একবার আহার করতেন ও সর্বক্ষণ শুভ্র-পরিচ্ছদ পরিধান করতে ভালবাসতেন। বৃদ্ধ বয়সে অশ্বারোহনে তিনি দূরবর্তী শিষ্যদের সংগে সাক্ষাৎ করার জন্যে ভ্রমণে বের হতেন। 'হিতকরী'র সংবাদ থেকে জানা যায়—মৃত্যুকালে তাঁর শিষ্য সংখ্যা প্রায় দশ হাজার ছিল।

খ. ধর্মমত ॥

লালন শাহের ধর্ম-জীবনের সঙ্গে তাঁর ধর্মমত সম্পর্কেও আলোচনা বিধেয়। বিভিন্ন ধর্মমতের সংমিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি যে নতুন ধর্মমতের উদ্ভব ঘটান—তা-ই একালের বাউল ধর্ম। পল্লী-গ্রামে এই সম্প্রদায়ের ফকীরদের "লালন শাঁই মতের ফকীর" বলা হয়।

বাউল মতবাদ পাক-ভারতের প্রাচীনতম লোকায়ত মতবাদের সঙ্গে তন্ত্র, বৌদ্ধ শূন্যবাদ, সাংখ্যযোগ, বৈষ্ণব সহজিয়া এবং সুফীবাদী ধ্যান-ধারণার সংমিশ্রণে উদ্ভূত। এ জন্যে একে কোনো নতুন ধর্ম না বলে নতুন মতবাদ রূপে চিহ্নিত করাই সংগত।

লালন-পূর্ববর্তী কালে বাউলধর্ম বলতে বোঝাত—তান্ত্রিক সহজিয়া যোগাচার। তার ফলে, প্রাক-লালন-পর্বে রচিত কোনো গীতে বা গ্রন্থে 'বাউল' শব্দের স্থিরতর অর্থ নেই।

"বাউল" শব্দের ইতিহাস অন্বেষণ করতে গিয়ে শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' ও শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' থেকে শুরু করেছেন। এ সব গ্রন্থেও পরবর্তী কালের সমস্ত মধ্যযুগীয় রচনায় এ শব্দটির অর্থ—পাগল বা উন্মাদ, সংসার ত্যাগী, তপস্বী, সন্ন্যাসী প্রভৃতি। লালন শাহ্ই সর্বপ্রথম শব্দটিকে সুনির্দিষ্ট দার্শনিক অর্থে ব্যবহার করেন। তিনি 'বাউল' শব্দের অর্থ করেছেন—'আত্মানুসন্ধানী'। পূর্বোক্ত শব্দের সঙ্গে এই শব্দটির উৎপত্তিগত প্রভেদও লালন শাহ্ নির্ণয় করেছেন। তিনি বলেছেন,

আমার আপন খবর নাহিরে কেবল
'বাউল' নাম ধরি।।

বেদ-বেদান্তে নাই যার 'উল্'
শুধুই কেবল নামে মশ্‌গুল
এ জগৎ ভরি'
'খবরদার' কারে বলা যায়
কিসে হয় খবরদারি।।

আপনার আপনি যে জেনেছে
'বা-উলে'র 'উল্' সেই পেয়েছে
সেই হুঁশিয়ারী।
কত মুনী,' ন্যাসী, যোগী, তপস্বী
খবর পায়না তারী।।

আউল বাউল আরেফ কামেল
আত্মতত্ত্বে হয়ে ফাজেল
যে দ্বারের দারী
আমি লালন পশুর চলন
কেমনে তারি।।

এ কবিতায় 'বাউল' শব্দটি যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাতে দেখা যায়—আরবী با (বা=অর্থ আত্ম) এবং ফার্সী اُل (উল্=অর্থ সহিত, খবর বা

সন্ধান) শব্দদ্বয়ের সংমিশ্রণে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি। এই অর্থারোপ লালন শাহের স্বকৃত এবং মৌলিক। কাজেই লালন-পূর্ববর্তী বাউল মতবাদের সঙ্গে লালন শাঁই-এর বাউল মতের সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সে বিষয়ে দুদ্দু শাহ্ লিখেছেন,

শাস্ত্র ধর্ম্ম তীর্থ আদি সর্ব্ব প্রবচন।
সকল ছাড়িয়া দিলেন মানুষ ভজন॥
বস্তু ছাড়া নাহি আর আল্লা কিংবা হরি।
এতি মত্ দেখ সবে নরবস্তু ধরি॥
যাহা বুঝিয়াছি আমি তাঁহার কৃপায়।
কাহারে বুঝাব উহা অধর কোথায়॥
রজঃ বীর্য্য এই দুই বস্তু যেবা চেনে।
লালন সাইজীকে সেইজন জানে॥

এই বস্তুবাদী ব্যাখ্যাই লালন-পূর্ববর্তী ও লালন-পরবর্তী বাউল মতবাদের মধ্যেকার সুস্পষ্ট পার্থক্যের সীমা চিহ্নিত করেছে। সমকালীন নাড়ার মত, কালার মত, সতীঘরার মত, কর্তাভজা মত যেখানে আধ্যাত্মিকতার রহস্যময় লোকে পরম সত্যে সন্ধান করত, লালন শাঁই মত তৎস্থলে নবতর সত্যের অনুসন্ধানে প্রজনন বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করে আপনাকে ব্যক্ত করেছে। বাউল মতের রূপান্তর সাধনে লালন শাহের এই দার্শনিক ভিত্তি অত্যন্ত প্রগতিশীল এবং মূল্যবান। সমগ্র ভাবে মানুষকেই তিনি স্রষ্টা ও সৃষ্টির মৌলিক সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। তাই লালন শাহ্ এ-তত্ত্বের নাম দিয়েছেন"মানুষ-তত্ত্ব"।

এ-তত্ত্বে স্রষ্টা "বস্তু" স্বরূপে (স্থূল রূপ রজঃ বীর্য আকারে) মানবদেহেই অধিষ্ঠিত। তিনি স্বর্গে, মহাশূন্যে বা অপর কোনো কাল্পনিক লোকে অবস্থিত নন। তাঁর নৈকট্য লাভ করতে হলে মানুষের দেশ-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই তাঁকে অন্বেষণ করতে হবে। সেই অনুসন্ধানের উপায় জানেন গুরু বা মুর্শিদ। বেদ-বেদান্ত, কোরান-পুরাণে তাঁর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়না। তাই লালন বল্ছেন

বেদে 'উল্' নাই তার
তাই বেদাচার
ছাড়ে ফকীর, বোষ্টমে॥

যেহেতু মানব-দেহেই সেই পরম-সত্য সৃষ্টিকর্তার অবস্থান, সেজন্যে লালন তাঁকে নবতর পরিভাষায় 'মনের মানুষ', 'অচিন মানুষ', 'অটল মানুষ', 'অটল চাঁদ', 'আলেক (আরবী علق অর্থ বীর্য) মানুষ' প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছেন। ইনিই ত্রিভুবন-পতি শাঁই। এ শাঁই (প্রভু)-এর কি রূপে সন্ধান পাওয়া যাবে, সে বিষয়ে লালন বলেছেন,

জানতে পারলে হরণ-পূরণ
সেই মানুষের পাবে অন্বেষণ ।।

এই হরণ পূরণ-যোগক্রিয়ার মাধ্যমেই তাঁকে ভজনা করতে হবে। কারণ,

মানুষ রূপে সেই দয়াময়
তাইতে মানুষ ভজিতে হয়
মানুষ-তত্ত্ব ভুলিয়া হায়
লালন ফকীর মরে ঘুরে ।।

লালন বলেছেন, এই দয়াময়—

শাঁই আমার অটল পদার্থ
নাহিরে তাঁর জন্মমৃত্যু
যদি জন্মমৃত্যু হয়
অটল চাঁদ কেন কয়
লালন বলে তা আর কয়জনে বোঝে ॥

কিন্তু এ-অটল চাঁদের 'উল্' পাওয়া যাবে কোথায়? লালনের উত্তর—জান গে যা রে 'স্বরূপ-দ্বারে'।
'স্বরূপ-দ্বার,' চর্যার বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধকদের 'দশমী-দ্বার' এবং যোণি-দ্বার—অভিন্ন।

মানুষ-তত্ত্বের সাধনায় এখানে তন্ত্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তান্ত্রিকদের মতই লালন স্বরূপ-দ্বারের বিস্তৃত ব্যাখ্যায় কুল-কুণ্ডলিনী (মূলাধার পদ্মে অবস্থিত)র জাগরণ, ষট্‌চক্রভেদ ও নানা যৌগিক ক্রিয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ,

শূন্য দেশে মেঘের উদয়
নীরদ বিন্দু বরিষণ সেথায়

'শূন্যদেশ'—অর্থাৎ মস্তকে সহস্রদল পদ্মের উর্ধ্বাকাশ থেকে যে বারি-বিন্দু ঋতুতে ঋতুতে বর্ষিত হয়, সেই বিন্দুই হোল 'মহারস'। যে,

মহারস মুদিত কমলে (অর্থাৎ সহস্রদল পদ্মে অমৃতরূপে সঞ্চিত)
প্রেম শৃঙ্গারে নাওগে খুলে
আত্ম সাবধান সে রণকালে
কয় ফকীর লালন।

আত্মসাবধানতা বলতে লালন বুঝিয়েছেন সুকঠিন সংযমের কথা। এ সংযম সহজ নয় বলে তিনি সাধককে 'জীয়ন্তে-মরা'-র উপদেশ দিয়েছেন। বলেছেন,

মর' জিন্দেগীর আগে।
দেখে শমন যাক ভেগে॥
আয়ু থাকতে আগে মরা
সাধক যে তার এমনি ধারা
প্রেমোন্মাদে মাতোয়ারা
সে কি বিধির ভয় রাখে
.....
হায়াতের আগে মরে যে
বাঁচে সে মউতের পিছে
করো রে মন এ সব দিশে
ফকীর লালন কয় ডেকে॥

আত্মশুদ্ধির জন্যে এই 'জীয়ন্তে-মরা'-র সাধনা—সুফীদেরও সাধনা। তাঁদের মতে এ-মৃত্যু চার রকমের। যথা,—

(১) শ্বেতবর্ণ মৃত্যু বা উপবাসাদির সাহায্যে ক্ষুৎ পিপাসা দমন

(২) কৃষ্ণবর্ণ মৃত্যু বা স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ ও বিপদে ধৈর্য ধারণ

(৩) রক্তবর্ণ মৃত্যু বা আত্মসংযম দ্বারা ইন্দ্রিয় বশ-করণ ও

(৪) হরিদ্বর্ণ মৃত্যু বা জীর্ণবস্ত্র ধারণ ও পার্থিব বস্তু থেকে পরিপূর্ণ রূপে নিরাসক্তি।

সুফীবাদী তাসাওয়াফের এই চারি শ্রেণীর মৃত্যুর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কুশায়রী তাঁর 'রিসালা'য় বলেছেন—"God should cause thee to die from thyself and to live in Him."[১০১] আল্-জুনায়েদ এই 'জীয়ন্তে-মরা' (to die from

১০১। A. G. Arberry. Sufism—An Account of the Mystics of Islam (George Allen & Unwin Ltd., London, Second impression, 1956), p. 58.

thyself) এবং তাঁর মধ্যে বেঁচে ওঠা-(to live in Him) কে যথাক্রমে 'ফানা' ও 'বাক্যা' বলেছেন।[১০২] লালনও বলেছেন,

আপনার আপনি ফানা হলে
তারে জানা যাবে।

অর্থাৎ লালন শাহেরও মৃত্যুর উদ্দেশ্য শুধু মৃত্যুই নয়, বেঁচে ওঠাও। জীয়ন্তে মরার মাঝে এভাবে বেঁচে ওঠা কিন্তু সুগভীর ও শুদ্ধ প্রেমের সম্পর্ক ভিন্ন সম্ভব নয়। মনের মানুষের সঙ্গে সাধকের এই সম্পর্ক ভয়ের নয় ভক্তির নয়, অনন্ত প্রেমের। তাই লালনের উক্তি,

শুদ্ধ প্রেম না দিলে ভজে
কে তারে পায়?

কিন্তু এই "শুদ্ধ প্রেমের উপার্জন" হবে কিসে? লালনের নির্দেশ,

মনি তুই হোস্‌নে শ্মশান-বাসী
কামলীলা কর্‌না সাধন
মনের মতন
পাবি হারাধন
পূর্ণ শশি॥

কাম-সাধনার মধ্যে এমন শুদ্ধ প্রেমের উদ্দীপনাকে দুগ্ধ থেকে মাখন নিষ্কাশনের সংগে তুলনা করা যায়। এ সাধনা অত্যন্ত কঠিন। তাই লালন বলেছেন,

জান্‌তে মরা যে প্রেম-সাধনে
তাই কি পারবি তোরা
যে প্রেমে কিশোর-কিশোরী
মজেছে দু'জন তারা॥

ধরে যে অরুণ কিরণ
কমলিনীর প্রফুল্ল বদন
তেমনি গো তুই সাধ্‌লে রতি
রাতি আকর্ষণে যাবে ধরা॥

১০২। ibdi. p. 58.

কামে কাম নিষ্কামী যে হয়
আছে কামরূপে কাম-শক্তির আশ্রয়
সে প্রেমেতে যে মজেছে
সেই 'জ্যান্‌তে-মরা' ॥
শুঁসায় শোঁযে না ছাড়ে আশ
তারা উজান তরী চালায় বারো বাস
লালন ফকীর ফাঁকে ব'ল
কঠিন দিকে ধারা ॥

কিন্তু "কামে কাম নিষ্কামী" হওয়া কি সম্ভব ? সে বিষয়ে লালনের যুক্তি,

যে জলেতে লবণ জন্মায়
সেই জলেই লবণ গলে যায়
তেমনি আমার মন-মনোরয়
'জন্ম-পথে' ম'ল সেতো ॥

কারণ,

নীরে নিরঞ্জন আমার
অর্ধলীলা করলেন প্রচার
হলে আপন জন্মের বিচার
সব জানা যায় ॥
আপনার জন্ম-লতা
খোঁজ তার মূলটি কোথা
লালন বলে হবে সেথা
শাঁইর পরিচয় ॥

লালন শাঁই-মতবাদের 'মা নুষ-তত্ত্বে'র এ-ই হোল সংক্ষিপ্ত রূপ-রেখা। লালন শাহ্ যে বিপুল এবং বহু বিস্তৃত দার্শনিক বিচারের উপর তাঁর এ-মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছেন ও সাধন-ভজনের পথ-পরিক্রমার নির্দেশ দিয়েছেন, সে-সম্পর্কে পূর্ণাংগ আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। এখানে শুধু স্মরণীয়, সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর যে আত্মানুসন্ধান যুগ যুগ ধরে নাড়ার ফকীর, কালার ফকীর, মাঁদার, সতীঘরা ও কর্তাভজা মতাবলম্বী এবং আউল-বাউল-শাঁই-দরবেশ, বৈরাগী-তান্ত্রিক-যোগী-সহজিয়া প্রভৃতি মতবাদীদের অনুপ্রেরণা যুগিয়ে এসেছে—লালন শাহের সারা জীবনের সাধনায় সেই অস্ফুট, অপূর্ণ লৌকিক ধ্যান-ধারণাই নব-কলেবরে আজ পরিপূর্ণ বিকশিত বাউল-দর্শনে রূপ লাভ করেছে।

॥ পরিশিষ্ট ॥

পরিশিষ্টে দুদ্দু শাহের রচিত লালন-জীবনী প্রকাশ করা হোল। এই ক্ষুদ্র কাব্য-পুস্তিকার মূল পাণ্ডুলিপির সাইজ ৯৫/৮″ × ৫৫/৮″ ইঞ্চি। জনাব শাহ্ লতীফ আফী আন্হু সাহেব এই পাণ্ডুলিপির কথা সর্বপ্রথম শিক্ষিত জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করেন। এটি তিনি পেয়েছিলেন, নবদ্বীপের চরব্রহ্ম নগর নিবাসী রামচন্দ্র মণ্ডল নামক জনৈক বৈষ্ণব ভদ্রলোকের নিকট থেকে। রামবাবু ১৩৫১ সালের পৌষ মাসে পাণ্ডুলিপিটি যশোর জেলাস্থ কালীগঞ্জ-হাটের (ঝিনাইদহ মহকুমা) বিষাইখালী গ্রামের জনৈক মুদীর দোকানে অন্যান্য পুরোন কাগজ-পত্রের সঙ্গে পেয়ে—হস্তগত করেন।

বন্ধুবর আফী আন্হু সাহেব পাণ্ডুলিপিটি আমাকে দেখতে ও নকল করতে অনুমতি দেন ১৩৭১ সালের মাঘ মাসে। তৎপর তিনি তা প্রকাশ করতেও অনুমতি দান করে বাধিত করেন। এ প্রসঙ্গে তাই তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

॥ লালন-জীবনী* ॥

"মানুষ গুরু লালন সাই দরবেশের চরণ সহায়।"

ধন্য ধন্য মহামানুষ দয়াল লালন সাই।
পতিত জনার বন্ধু তাঁর গুণ গাই॥
জাতি ধর্ম্ম শাস্ত্র আদি মিমাংসা করিয়া
নব সত্য প্রকাশিল মানব লাগিয়া॥

আমার দয়াল মুরশীদ কৃপা প্রকাশিয়া।
তাঁর আত্মকথা কিছু গিয়াছে বলিয়া।
তাঁর মহা আত্মকথা আমি কি জানিব।
যার কথা সে যদি না কয় কিসে প্রকাশিব॥

* এ-নাম লেখক কর্তৃক প্রদত্ত।

আলম ডাঙ্গা গ্রামে শুকুর সার আশ্রমে।
আরজি করিনু আমি অতিব নির্জ্জনে॥
দয়াল দরদি সাই করুণা করিয়া।
কহ কিছু আত্ম-কথা এদাসে বুঝাইয়া॥
এত শুনি দয়াল সাই মোর পানে চায়।
মৃদু হাসি এই দাসে যাহা কিছু কয়॥
বহুদিন সেই কথা রাখিনু ঢাকিয়া।
সাইজির ছিল মানা নাহি প্রকাশিবা॥
নাহি জানি কবে আমি যাইব চলিয়া।
তাঁর আত্মকথা যাইবে গোপন হইয়া॥
একারণে শেষকালে লঙ্গি তাঁর বাণী।
একান্ত বিনয়ে লিখি তাঁর জীবনী॥
মুখ্‌তাছার তার কিছু বর্ণণা করিব।
তাঁহার চরণমূলে ফানা হয়ে যাব॥
এগারশো ঊনআশী কার্ত্তিকের পহেলা।
হরিশপুর গ্রামে সাইর আগমন হইলা॥
যশোহর জেলাধিন ঝিনাইদহ কয়।
উক্ত মহাকুমাধিন হরিষপুর হয়॥
গোলাম কাদের হন দাদাজি তাঁহার।
বংশ পরম্পরা বাস হরিষপুর মাঝার॥
দরীবুল্লাহ্‌ দেওয়ান তাঁর আব্বাজির নাম।
আমিনা খাতুন মাতা এবে প্রকাশিলাম॥
শিশুকালে সাইজিরে তাঁরা ছাড়ি গেলা।
অনাথ হইল চাঁদ বিধাতার খেলা॥ [১/৩৩]
এমনি নিদানকালে বৈশাখ মাসেতে।
আনমনে একাকী সে রহে বসে পথে॥
সাইজির লীলা খেলা কে বুঝিতে পারে।
সিরাজ সা দরবেশে দেখে নিল তাঁরে ঘরে॥

কুলবাড়ী হরিষপুরে সিরাজ সা'র বাস।
পাল্কী টানিয়া করে জীবিকার অন্বাষ॥
কালক্রমে সাই তাঁরে বায়াৎ করিল।
মানুষ তত্ত্বাদি সব বুঝাইয়া দিল॥
ছাব্বিশ বৎসর যবে বয়স তাঁহার।
উহারাও ছাড়ি গেল নিজ নিজ ঘর॥
এমনিই কিশোর কালে ফকিরের বেশে।
নবদ্বীপ ধামে গিয়া আপনি প্রকাশে॥
পদ্মাবতী নামে এক বিধবা রমণী।
নিজাবাসে লয়ে গেল সেহি ক্ষত্র ধনী॥
পদ্মাবতীর গৃহে কিছুকাল যায়।
একদিন যান এক পণ্ডিত সভায়॥
পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁরে বিবিধ পুছিল।
সাইজি নাম ধাম সকলি বলিল॥
সেবার সময় হইল পণ্ডিত সভার।
যবন বলিয়া দূরে সেবা দেয় তাঁর॥
সাইর লীলা কিছুমাত্র বুঝা নাহি যায়।
প্রতি একজনার মাঝে লালনে দেখায়॥
উহা দেখি পণ্ডিত গণ চমকিত হইল।
সবে ভাবে মনে মনে কোন জন আইল॥
ছলিতে আইল বুঝি গৌরাঙ্গ সুজন।
দূরে রেখে সেবা দিনু কাহারে এখন॥
তখনি সকলে মিলি গৌরধ্বনি করে।
করজোড়ে নত শিরে দুটী পদ ধরে॥
মিনতি করিয়া কাঁদে দয়াল গোঁসাই।
মোদের ছলিতে এলে মোরা বুঝি নাই॥
ক্ষমা কর দীনবন্ধু পাতকী জনারে।
গড়াগড়ি যায় আর এমত ফুকারে॥ [২/৬৫]

তখনি দয়াল সাই বুঝাইয়া বলে।
বিভিন্নতা করিও না জাতি-ধর্ম্ম ব'লে॥

আলেখ অধর সেই দয়াময় সাই।
সৃষ্টি স্থিতি জুড়ে তার জাতি গোত্র নাই॥
জাতি ধর্ম্ম কুলগোত্র মানুষের সৃজন।
ভিন্ন বলে কিছু আমি দেখিনা কখন॥
সকল জনার মাঝে একই সেই ঈশ্বর।
নানাস্থানে নানারূপে করেন বিহার॥
এই মতে একে একে নানা মহালীলা।
কাশী বৃন্দাবন ধামে গিয়া প্রকাশিলা॥
যুগ অবতার বলি সর্ব্বভক্ত গণ।
করিতে লাগিল তাঁর চরণ-বন্দন॥
হেনকালে একদিন খেঁতরী গেরামে।
উপনীত হইলেন ভ্রমণ কারণে॥
তথা হইতে নৌকাযোগে ভ্রমণ কারণ।
দক্ষিণ পূর্ব্ব দেশে করিলেন গমন॥
কি জানি কেমনে তিনি বসন্ত ব্যাধিতে।
আক্রান্ত হইলে তাঁরে ফেলায় নদীতে॥
ভক্তবৃন্দ নাহি ছিল সঙ্গেতে তাহার।
মাঝিগণ ফেলে তাঁরে দরিয়া মাঝার॥
ভাসিতে ভাসিতে তিনি কালীগঙ্গা তীরে।
ছেউড়িয়া গ্রামের পাশে এক ঘাট ধারে॥
ভাসিতে ছিলেন যবে অচেতন হালেতে।
দেখি পরমাত্ম ভাই মলম নামেতে॥
সযতনে তুলে আনে আপনার ঘরে।
দুগ্ধ আদি নানা পথ্য দিয়া সেবা করে॥
এই রূপে একমাস গুজারিয়া যায়।
ব্যাধি মুক্ত হন তিনি খোদার কৃপায়॥

একদা মলম মম পরমাত্ম ভাই।
অমন ভক্ত পদে প্রণাম জানাই॥
নিজমনে তেলাওত করেন কোরান।
সাই ভুল ধরি তার করেন ফরমান॥ [৩/৯৫]

কি পড় কোরয়ান মিঞা এত ভুল করি।
শুনিয়া মলম ভাই পুলকিত ভারি॥
মিষ্ট বচনে তবে তাহারে শুধায়।
কি করে জানিলে তুমি পাঠে ভ্রান্তি হয়॥
এত শুনি সাই তারে বুঝাইয়া দিল।
নাহি জানি লেখা-পড়া ইহাই বলিল॥
দয়াল মুরশীদ মোরে লাদুন্নির জ্ঞান।
কিঞ্চিৎ দিয়াছে তায় করিনু বয়ান॥
এই ভাবে দিনে দিনে দিন গত হইল।
মলম সা ভাই তারে গুরু করে নিল॥
বাড়ীর দক্ষিণ দিকে তেঁতুল তলায়।
আস্তানা করিয়া দিল মুরশীদ সেবায়॥
স্বামী স্ত্রী দুইজনে তাহার কদমে।
হাজের হইয়া রহে হুজুরী মোকামে॥

তখন তাহার বয়স তেতাল্লিশ হইল।
চারিদিক হইতে বহু ভক্ত জুটিল॥
নানা দেশ হতে শেষে আসে নানাজন।
তর্ক করিতে কেহ করে আগমন॥
চক্কর ফক্কর আর মানিক মলম।
কোরবান মনিরদ্দিন আসে কতজন॥
কতজন ছিল মোর প্রভুর গোলাম।
কি কব তাদের পদে হাজার সালাম॥

বাহাছ করিতে গিয়া বায়াৎ হইনু।
আমি অতি অভাজন লালন সাই বিনু॥
বার শত পচানব্বই বাঙ্গালা সনেতে।
পহেলা কার্ত্তিক শুক্রবার দিবা অন্তে॥
সবারে কাঁদায়ে মোর প্রাণের দয়াল।
ওফাৎ পাইল মোদের করিয়া পাগল॥
মো অধমে বাবা বলে কে আর ডাকিবে।
আমার এই দীন মুখে চুম্বন করিবে॥
অমন মধুর বাণী কে আর শোনাবে।
আর কি ছেউড়িয়া ধামে করুণা বর্ষিবে?
চাঁদের বাজার কি গো মিলাইবে আর।
হিন্দু-মুছল্‌মান সবে করে হাহাকার॥
আমি দীন দুদ্দু নাম দীনের অধিন।
সারা অঙ্গে আজু মোর আজারির চিন॥ [৪/১৩১]

বেলতলা হরিষপুরে জনম আলয়।
কেহ কেহ কুলবড়ী হরিষপুর কয়॥
শাস্ত্র ধর্ম্ম তীর্থ আদি সর্ব্ব প্রবচন।
সকল ছাড়িয়া দিলেন মানুষ ভজন॥
বস্তু ছাড়া নাহি আর আল্লা কিংবা হরি।
এহি মত্‌ দেখ সবে নরবস্তু ধরি॥
যাহা বুঝিয়াছি আমি তাঁহার কৃপায়।
কাহারে বুঝাব উহা অধর কোথায়॥
রজঃ বীর্য্য এই দুই বস্তু যেবা চিনে।
লালন সাইজিকে সেই জন জানে॥

মানুষ অবতার সাই তাহার মহিমা।
কি বলিব আমি হীন নাই তার সীমা॥
ওলিয়ে আরেফ সাই বাঙ্গালা দেশেতে।
দীনহীন দুদ্দু ভনে তাঁহার কৃপাতে॥

দয়াল মুরশীদ সাই আল্লাহু আলেখ্।
যারে ধরে মিলিয়াছে বরজখ্ ছালেক॥ [৫/১৪৭]

সন ১৩০৩ সাল ১লা কার্ত্তিক
বার্ষিক অধিবাস ছেঁউড়িয়া
থানা ভালুকা জেলা নদীয়া [৫/১৪০]*

* মূল পাণ্ডুলিপির হুবহু অনুলিপি। বানান, শব্দ ব্যবহার ও অনুচ্ছেদ-বিন্যাস অবিকৃত রাখা হয়েছে। —লেখক

গ্রন্থপঞ্জী

ক. মূল গ্রন্থ

১। আনিসুজ্জামান — মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৩৭১।

২। আবদুল হাই, মুহম্মদ ও সৈয়দ আলী হাসান — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—আধুনিক যুগ, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ১৩৭১।

৩। করিম, অধ্যাপক আনোয়ারুল — বাউল কবি লালন শাহ্, সাহিত্য নিকেতন, কুষ্টিয়া, ১৯৬৩।

৪। ভট্টাচার্য, শ্রী উপেন্দ্রনাথ — বাংলার বাউল ও বাউল গান, দীপান্বিতা, কলিকাতা, ১৩৬৪।

৫। মনসুরউদ্দীন, মুহম্মদ — বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা—২য় খণ্ড, ঢাকা, ১৩৭১।
হারামণি—৫ম খণ্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৩৬১।
হারামণি—৭ম খণ্ড, বাঙ্লা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৭১।

৬। মান্নান, কাজী আবদুল — আধুনিক বাঙ্লা সাহিত্যে মুস্লিম সাধনা—১ম খণ্ড, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৬৮।

৭। সেন শাস্ত্রী, শ্রী ক্ষিতিমোহন — বাংলার বাউল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৫৪।

৮। Arberry, A. J. — Sufism—An Account of the Mystic of Islam, Allen & Unwin Ltd., London, 1956.

খ. সম্পাদিত-গ্রন্থ

১। কামাল উদ্দীন, মুহম্মদ — লালন-গীতিকা—১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৬২।

২। দাশ, শ্রী মতিলাল ও শ্রী পীযুষ কান্তি মহাপাত্র — লালন-গীতিকা, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৫৮।

গ. পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী

১। তালিব, মুহম্মদ আবু — লালন শাহ্ প্রসঙ্গ, দৈনিক ইত্তেফাক, রবিবাসরীয় সংখ্যা, ১লা মাঘ, ১৩৬৭।

২। দাশ, শ্রী মতিলাল — লালন ফকিরের গান, মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ, ১৩৪১।

৩। পাল, শ্রী বসন্তকুমার — ফকির লালন শাহ্, প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩২।

৪। ভট্টাচার্য, শ্রী মোক্ষদাচরণ — নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩১২।

৫। মনসুর উদ্‌দীন, মুহম্মদ — i) লালন ফকিরের গান, সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৫।
ii) লালন সঙ্গীতের সূচীপত্র, লোক-সাহিত্য—৩য় খণ্ড, আষাঢ়, ১৩৭১।

৬। সেখ, অধ্যাপক আফসার উদ্দীন — লালন জীবন-জিজ্ঞাসার এক অধ্যায়, কুষ্টিয়া কলেজ বার্ষিকী, ১৯৬৫।

৭। হোসেন, মোহাম্মদ শরীফ — লালন শাহের জন্মস্থান, দৈনিক ইত্তেফাক, রবিবাসরীয় সংখ্যা; ৮ই মাঘ, ১৩৬৭।

৮। Wali, Maulavi Abdul — On Curious Tenets and Practices of a Certain Class of Faqirs of Bengal. The Journal of the anthropological Society of Bombay. Education Society's Press, Bombay, 1900.

ঘ. পাণ্ডুলিপি

১। শাহ্, দুদ্দু — লালন-জীবনী, মূল রচনা ১৩০৬। সাইজ ৯৳″ × ৫৳″।